# বিপণন কার্যক্রম এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি
# Marketing Program and Brand Equity

**ইউনিট ৬**

## ভূমিকা

ব্র্যান্ড উপাদান হলো একটি স্বতন্ত্র উপাদান যেমন- নাম, লোগো, স্লোগান, প্রতীক বা চিহ্ন যা বাজারে একটি ব্র্যান্ডকে চিহ্নিত করতে এবং প্রতিযোগী ব্র্যান্ড থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। এই উপাদানগুলো ব্র্যান্ড স্বীকৃতি এবং ভোক্তাদের উপলব্ধি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাশাপাশি ব্র্যান্ড উপাদানগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা গেলে তা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানিগুলো তাদের বাহ্যিক বিপণন পরিবেশের বিশাল পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তাদের বিপণন কার্যক্রমের রীতিনীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেছে। অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও আইনগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তনগুলো বিপণনকারীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ফলে তাদের ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা এবং আনুষাঙ্গিক পণ্য, মূল্য নির্ধারণ, বণ্টন প্রণালী ও প্রসার কৌশলে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে।

এই ইউনিটে মোট দশটি পাঠ রয়েছে। প্রথম পাঠে ব্র্যান্ড উপাদান,ব্র্যান্ড উপাদানের প্রকারভেদ, ব্র্যান্ড উপাদান নির্ধারণ করার নির্ণায়ক এবং ব্র্যান্ড উপাদান পছন্দ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে ব্র্যান্ড নাম, ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়, কার্যকর ব্র্যান্ড নামের গুণাবলী এবং ব্র্যান্ড নামের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাঠে ইউআরএল এবং লোগো ও প্রতীকের প্রাথমিক ধারনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে ব্র্যান্ড চরিত্র, স্লোগান এবং ঝংকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম পাঠে মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং এর ধারনা, প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, এবং প্যাকেজিং পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ষষ্ঠ পাঠে বিপণনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, পণ্য কৌশল এবং বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম পাঠে মূল্য নির্ধারণ কৌশল, মূল্য সম্পর্কে ভোক্তা অভিমত অনুধাবন, ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্য স্থিতিশীলতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টম পাঠে বণ্টন প্রণালী কৌশল, প্রণালী ডিজাইন, প্রত্যক্ষ বণ্টন কৌশল, পরোক্ষ বণ্টন কৌশল, অনলাইন কৌশল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম পাঠে প্রসার কৌশল, বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহ, যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল, নতুন বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইনের সম্ভাব্য ভূল, আদর্শ বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইনের অর্জন,এবং একাধিক প্রসার উপাদানের ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। দশম পাঠে বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহ, বিক্রয় প্রসার, ইভেন্ট স্পন্সরশীপ, ব্র্যান্ড পরিবর্ধক, সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

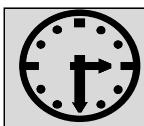

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-৬.১ : ব্র্যান্ড উপাদান
পাঠ-৬.২ : ব্র্যান্ড নাম
পাঠ-৬.৩ : ইউআরএল , লোগো এবং প্রতীক
পাঠ-৬.৪ : ব্র্যান্ড চরিত্র, স্লোগান এবং ঝংকার
পাঠ-৬.৫: মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং
পাঠ-৬.৬: পণ্য কৌশল
পাঠ-৬.৭ : মূল্য কৌশল
পাঠ-৬.৮: বণ্টন প্রণালী কৌশল
পাঠ-৬.৯: যোগাযোগ কৌশল
পাঠ-৬.১০: বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহ

# পাঠ-৬.১ ব্র্যান্ড উপাদান
# Brand Elements

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্র্যান্ড উপাদান কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড উপাদানের বিভিন্ন প্রকারভেদ/বিকল্প ও কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড উপাদান নির্ধারণ করার নির্ণায়ক সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড উপাদান পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্র্যান্ড উপাদানগুলো বলতে সেসব স্বতন্ত্র উপাদানগুলোকে বুঝায় যা ব্র্যান্ডটিকে সনাক্ত করতে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের অনন্য পরিচয় তৈরি করে। প্রধান ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যান্ডের নাম, ইউআরএল, লোগো, প্রতীক বা চিহ্ন, চরিত্র, মুখপাত্র, স্লোগান, জিঙ্গেল, প্যাকেজিং, সাইনেজ এবং রঙের স্কিম ইত্যাদি। ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে নির্ধারণ করার সময় এসব উপাদানের স্মরণযোগ্যতা, অর্থপূর্ণতা, পছন্দযোগ্যতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতা বিবেচনা করতে হয়। ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর যথাযথ সংমিশ্রণ ব্যবহার করে যেকোন কোম্পানি একটি শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় ব্র্যান্ড উপস্থিতি গড়ে তুলতে পারে যা কোম্পানিটিকে তার গ্রাহকদের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী বাজার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

## ব্র্যান্ড উপাদান কী?
## What are Brand Elements?

ব্র্যান্ড উপাদানগুলো হলো একটি ব্র্যান্ডের বাস্তব কিছু দিক, গ্রাহকরা প্রতিনিয়ত যেগুলোর সংস্পর্শে আসে। এই উপাদানগুলো একটি ব্র্যান্ডকে অন্য ব্র্যান্ড থেকে আলাদা করে এবং এমন একটি স্বীকৃত প্রতীক বা পরিচিতি প্রদান করে যা কোম্পানি বা পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে এই উপাদানগুলোকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে এমন একটি নকশা তৈরি করতে হয় যা একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড পরিচয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে এবং এটিকে গ্রাহকদের জন্য অনুরণিত এবং স্মরণীয় করে তুলবে।

ব্র্যান্ড উপাদানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Brand elements, sometimes called brand identities, are those trademarkable devices that serve to identify and differentiate the brand". অর্থাৎ, ব্র্যান্ড উপাদানগুলো বলতে সেই ট্রেডমার্কযোগ্য ডিভাইস বা উপাদানগুলোকে বুঝায় যা ব্র্যান্ডটিকে সনাক্ত করতে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করতে সহায়তা করে। ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে কখনও কখনও ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বা ব্র্যান্ড পরিচয়ও বলা হয়।

প্রধান ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যান্ডের নাম, ইউআরএল, লোগো, প্রতীক বা চিহ্ন, চরিত্র, মুখপাত্র, স্লোগান, জিঙ্গেল, প্যাকেজ, সাইনেজ এবং রঙের স্কিম ইত্যাদি। গ্রাহক ভিত্তিক ব্র্যান্ড ইক্যুইটি মডেল থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, বিপণনকারীদের এমনভাবে ব্র্যান্ড উপাদানগুলো নির্বাচন করা উচিত যেন তা ব্র্যান্ডের সচেতনতা বাড়াতে পারে; শক্তিশালী, অনুকূল এবং অনন্য ব্র্যান্ড এ্যাসোসিয়েশন গঠনে সহায়তা করতে পারে; এবং ইতিবাচক ব্র্যান্ড রায় এবং অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। একটি ব্র্যান্ড উপাদান যা কোম্পানির ব্র্যান্ড ইক্যুইটিতে একটি ইতিবাচক অবদান রাখে, তা নির্দিষ্ট মূল্যবান এ্যাসোসিয়েশন বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্র্যান্ড উপাদানগুলো হলো কোম্পানির ব্র্যান্ডের অনন্য দিক যা নাম, লোগো, রঙের স্কিম, স্লোগান ইত্যাদি ব্যবহার করে কোম্পানির ব্যবসার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্বীকৃত এবং অনন্য প্রতীক তৈরি করে এবং এই উপাদানগুলো ক্রমশ কোম্পানির সবকিছুর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। ব্র্যান্ডেড উপাদানগুলোর স্বতন্ত্রতা কোম্পানিকে প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা হতে সাহায্য করে।

## ব্র্যান্ড উপাদানের বিভিন্ন প্রকারভেদ/বিকল্প ও কৌশলসমূহ

## Options and Tactics for Brand Elements

আমরা সবাই কমবেশি অ্যাপলের নাম শুনেছি। "অ্যাপল" নামটি ব্যক্তিগত কম্পিউটারের নাম হিসেবে ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ছিল। অ্যাপল নামটি সহজ কিন্তু শব্দটি সুপরিচিত হওয়ায় এটি এই পণ্য শ্রেণির মধ্যে স্বতন্ত্র ছিল এবং এটি ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করেছে। নামটির অর্থ কোম্পানিকে একটি "বন্ধুত্বপূর্ণ উজ্জ্বলতা" এবং উষ্ণ ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। আবার এটিকে একটি লোগোর মাধ্যমে দৃশ্যমান করা গেছে যা ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সীমারেখা জুড়ে সহজেই স্থানান্তরিত করা গেছে। পরিশেষে, অ্যাপল নামটি ম্যাকিনটোশের মতো সাব-ব্র্যান্ডগুলোকে চালু করার জন্য একটি প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করে ব্র্যান্ড এক্সটেনশন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অ্যাপল নামটি যেমন প্রমাণ করেছে একটি সঠিকভাবে নির্বাচিত ব্র্যান্ড নাম ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি অন্যান্য ব্র্যান্ড উপাদানও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা গেলে তা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে প্রশংসনীয় অবদান রাখতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন ধরণের ব্র্যান্ড উপাদান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

**১। ব্র্যান্ড নাম (Brand Name):** ব্র্যান্ডের নাম ব্র্যান্ডের মৌলিক একটি উপাদান কারণ এটি একটি পণ্যের মুল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলে। ব্র্যান্ড নাম একটি ব্র্যান্ডের পরিচয়কে প্রকাশ ও প্রচার করে। ব্র্যান্ডের নাম যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম। যেখানে একটি বিজ্ঞাপন ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং একটি বিক্রয় কল ১ ঘন্টার মতো স্থায়ী হতে পারে, সেখানে গ্রাহকরা ১ সেকেন্ডের মধ্যেই ব্র্যান্ডের নাম মনে করতে পারেন এবং এটি কি কাজে ব্যবহৃত হয়, সেটিও মনে করতে পারেন। একটি ব্র্যান্ডের নাম একটি কোম্পানি বা পণ্যের জন্য একটি বিশেষ ট্যাগের মতো যা কোম্পানি বা পণ্যকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফুটিয়ে তোলে। যেহেতু ব্র্যান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হলো ব্র্যান্ড নাম, তাই কোম্পানি এটির সদ্বব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ অফিসে নামটির নিবন্ধন করে। পাশাপাশি তারা আকর্ষণীয় লোগো ব্যবহার করে যাতে গ্রাহকেরা সহজেই ব্র্যান্ডটিকে চিনতে পারে। গুগল, এপল এবং নাইকি এর মতো বড় প্রতিষ্ঠান গুলো এটিই করেছে এবং এটি বাজারে তাদের ব্যাপক পরিচিত ও গ্রাহক বিশ্বস্ততা অর্জনে সাহায্য করেছে।

**২। ইউআরএল (URLs):** ইউআরএল (Uniform Resource Locators) মূলত ওয়েবপেজের নির্দিষ্ট অবস্থানকে বুঝায়। ইউআরএল ওয়েবসাইটে ব্র্যান্ডের তথ্যের নির্দিষ্ট ওয়েবপেজের স্থানকে নির্দেশ করে এবং একে সাধারণত ডোমেইন নামও বলা হয়। কেউ নির্দিষ্ট ইউআরএল এর মালিক হতে চাইলে হলে তাকে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে এবং সেই ইউআরএল পেতে টাকা দিতে হবে। যেকোন বিপণনকারী নিজের বা কোম্পানির নামের জন্য অর্থব্যয় করে ডোমেইন কিনতে পারেন। কোম্পানীগুলোর আবেদনের কারণে নিবন্ধিত ইউআরএলের সংখ্যা বর্তমানে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানি URLs এর মাধ্যমে নির্ধারিত ব্র্যান্ড নামকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। তাই ডোমেইন কিনে নাম নিবন্ধনের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো URLs কে কোম্পানির একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে। যেমন- অ্যাপলঃ https://www.apple.com/, গুগলঃ https://www.google.com/, অ্যামাজনঃ https://www.amazon.com/, মাইক্রোসফটঃ https://www.microsoft.com/ ইত্যাদি হলো URLs এর উদাহরণ।

**৩। লোগো এবং প্রতীক (Logos and Symbols):** যদিও ব্র্যান্ডের নাম সাধারণত ব্র্যান্ডের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবুও দৃশ্যমান উপাদানগুলো যেমন-লোগো বা প্রতীকও ব্র্যান্ড ইক্যুইটি এবং বিশেষ করে ব্র্যান্ড সচেতনতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপত্তি, মালিকানা, অনুষঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয়ে ক্ষেত্রে দীর্ঘ ইতিহাস নির্দেশ করার ক্ষেত্রে লোগোর ভূমিকা রয়েছে। লোগো বা প্রতীক হলো একটি ব্র্যান্ড বা কোম্পনির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নকশা করা দৃশ্যমান উপাদান। এরা সংক্ষিপ্তভাবে ব্র্যান্ড কে উপস্থাপন করে। লোগোগুলো সাধারণত রং, আকার এবং টাইপোগ্রাফির অনন্য সংমিশ্রণে তৈরী করা হয় এবং প্রতীক গুলো সাধারণ ভাবে সরলীকৃত উপায়ে ভিজ্যুয়ালি উপস্থাপন করা হয়।

**৪। ব্র্যান্ড চরিত্র (Brand Characters):** ব্র্যান্ড চরিত্র বলতে সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের ব্র্যান্ড প্রতীককে বুঝায় যা মানুষের বা বাস্তব জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। ব্র্যান্ড চরিত্র মূলত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় এবং এটি বিজ্ঞাপন প্রাচারাভিযান ও প্যাকেজ নকশা প্রণয়নে মূল ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, ব্র্যান্ড চরিত্র হলো মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির একটি সংগ্রহ যা একটি ব্র্যান্ডকে সংজ্ঞায়িত করে এবং গ্রাহক আকর্ষণের মাধ্যমে তাকে অনন্য করে

তোলে। এটি এমন একটি কাঠামোকে নির্দেশ করে যা কোম্পানির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পণ্য ও সেবার অফারিং এবং ব্র্যান্ড আর্কিটেকচারকে সংজ্ঞায়িত করে। এছাড়াও এটি ব্র্যান্ডটির মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করে, ব্র্যান্ডের অনন্য বিক্রয় প্রস্তাবনা এবং মৌলিক বিষয়গুলোকে লক্ষ্যস্থিত বাজারের সাথে সংযুক্ত করে। এই ব্র্যান্ড চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কোম্পানিকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে এবং বাজারের শেয়ার মূল্য বাড়ায়। ব্র্যান্ড চরিত্রগুলোর কিছু আছে অ্যানিমেটেড চরিত্র যেমন- মীনা, রাজু এবং মিঠু (মীনা কার্টুনে), হালুম, টুকটুকি, ইকরি, এবং শিকু (১২৩ সিসিমপুরে), আর কিছু আছে বাস্তবিক চরিত্র যেমন- জুয়ান ভালদেজ (কলম্বিয়ান কফি) এবং রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের মতো লাইভ-অ্যাকশন ফিগার।

**৫। স্লোগান (Slogan):** স্লোগান হচ্ছে ক্ষুদ্র বাক্যাংশ যা ব্র্যান্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেয় অথবা প্ররোচিত তথ্যের মাধ্যমে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে। স্লোগানকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, তবে এটি প্যাকেজিং এবং বিপণন এর অন্যান্য কাজগুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্লোগানকে তাই ব্র্যান্ড নির্মানের মজবুত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন- স্নিকার্সের বিজ্ঞাপন "ক্ষুধার্ত? একটি স্নিকার্স নাও", স্লোগানটা আবার ক্যান্ডি বারের প্যাকেজিংয়েও দেখা গিয়েছিলো। অর্থাৎ, একটি ব্র্যান্ড স্লোগান  হলো একটি ছোট এবং মনে রাখার মতো বাক্যের অংশ বা ট্যাগলাইন যেটি একটি ব্র্যান্ডকে সংক্ষেপে এর মান এবং অনন্য বিক্রয় প্রস্তাবনা বুঝাতে সাহায্য করে। স্লোগানগুলোকে আকর্ষণীয়, প্রভাবশালী এবং সহজেই মনে রাখার মতো করে তৈরী করা হয়। যেমন- নাইকির স্লোগান হলো "জাস্ট ডু ইট", অ্যাডিডাসের "কোন কিছুই অসম্ভব নয়", অ্যাপলের "ভিন্ন ভাবে ভাবুন" ইত্যাদি।

**৬। ঝংকার (Jingles):** ঝংকার হলো ব্র্যান্ডকে কেন্দ্র করে লেখা সঙ্গীতময় বার্তা। সাধারণত পেশাদার গীতিকারদের দিয়েই ঝংকার লিখে নেওয়া হয়। সুশ্রাব্য এই ব্র্যান্ড বার্তাগুলো ব্র্যান্ডের অর্থ ও কার্যকারিতা সুরে সুরে প্রকাশ করে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে এবং দীর্ঘদিন গ্রাহকদের মণিকোঠায় থেকে যায়। ঝংকারকে তাই অনেক সময় সম্প্রসারিত সঙ্গীতময় স্লোগান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। যেমন- ড্যানিশ কনডেন্সড মিল্কের বিজ্ঞাপনে বলা হতো "তুমি, আমি আর ড্যানিশ", যা এখনো আমাদের কানে বাজে।

**৭। মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং (Packaging):** প্যাকেজিং হলো একটা পণ্যের আবরণ বা মোড়ক নকশা ও উৎপাদন করা সম্পর্কিত কাজ। পণ্য পরিবহনের সময় নাড়াচাড়ায় ভেঙ্গে যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা সংরক্ষণের কারণে স্বাদ, গন্ধ বা রঙয়ের পরিবর্তন থেকে রক্ষা করতে প্যাকেজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ব্র্যান্ডের প্যাকেজিং হলো একটি পণ্যের বাহ্যিক আবরণের নকশা তৈরি করা এবং পণ্যসংক্রান্ত জরুরি কিছু তথ্যের সমন্বিত কিন্তু পরিকল্পিত উপস্থাপনা। এটি যেমন পণ্যকে বাহ্যিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, তেমনি ব্র্যান্ডের পরিচিতি জানাতে এবং গ্রাহকদের ধারণাকে পাল্টাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি কার্যকর প্যাকেজিং ব্র্যান্ড কে চেনাতে বা মনে রাখতে এবং ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন- নিওকেয়ার এর বেবি ওয়াইপস বা শিশুদের ভেজা টিস্যু এমনভাবে প্যাকেজিং করা হয় যেন তা সহজে খোলা যায়, পর্যাপ্ত আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে এবং গ্রাহকরা সুবিধাজনক আকারে একে কিনতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত ব্র্যান্ড উপাদানগুলো দ্বারা একটি কোম্পানি তার ব্র্যান্ডিং করতে পারে এবং প্রতিযোগীদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বাজার অবস্থান তৈরি করতে পারে।

### ব্র্যান্ড উপাদান নির্ধারণ করার নির্ণায়ক

## Criteria for Choosing Brand Elements

ব্র্যান্ড বলতে আমরা বুঝি একটি নাম, শব্দ, চিহ্ন, নকশা বা সেগুলোর একটি সংমিশ্রণ যা একজন বিক্রেতা বা বিক্রেতাগোষ্ঠীর পণ্য এবং সেবাগুলোকে চিহ্নিত করতে এবং প্রতিযোগীদের থেকে তাদের আলাদা করতে সাহায্য করে। আর ব্র্যান্ড তৈরি করার মূল চাবিকাঠি হলো এমন একটি নাম, লোগো, প্রতীক, প্যাকেজ নকশা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করা যা একটি পণ্যকে সনাক্ত করে এবং বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে। একটি ব্র্যান্ডের এই বিভিন্ন উপাদান যা এটিকে সনাক্ত করতে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে তাই হলো ব্র্যান্ড উপাদান।

সাধারণভাবে একটি ব্র্যান্ড উপাদান নির্বাচন করার জন্য ছয়টি মানদন্ড রয়েছে। এই নির্ণায়ক বা মানদন্ডগুলো হলো স্মরণযোগ্যতা, অর্থপূর্ণতা, পছন্দযোগ্যতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতা। এই মানদন্ডলোকে চিত্রের সাহায্যে সহজভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

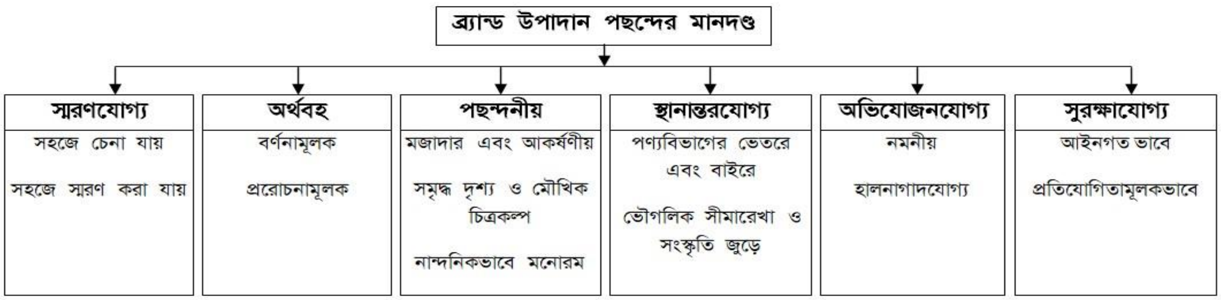


চিত্র: ব্র্যান্ড উপাদান নির্বাচন করার মানদন্ড

প্রথম তিনটি মানদন্ড- স্মরণযোগ্যতা, অর্থবহতা এবং পছন্দযোগ্যতা-বিপণনকারীর আক্রমণাত্মক কৌশল এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি করে। পরের তিনটি নির্ণায়ক- স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতা- বিভিন্ন সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতার মুখে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি ও বজায় রাখার জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো:

**১। স্মরণযোগ্যতা (Memorability):** ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো উচ্চ স্তরের ব্র্যান্ড সচেতনতা অর্জন করা। যেসব ব্র্যান্ড উপাদানগুলো সেই লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেয়, সহজভাবে মনে রাখা যায় এবং সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেগুলো কেনাকাটা বা ভোগের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা বা স্বীকৃতিকে সহজ করে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি করে। অর্থাৎ, যে উপাদানটি গ্রাহকেরা সহজেই মনে রাখতে পারবে সেটি দিয়ে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি করা সহজ হয়। উদাহরণ স্বরূপ Lux, Lifebuoy, Nokia, Samsung এসব ব্র্যান্ড নামের কথা বলা যায়, যেগুলো গ্রাহকেরা সহজেই মনে রাখতে পারেন এবং এসব ব্র্যান্ডের নাম গ্রাহকদের মনে আঠার মতো লেগে থাকে।

**২। অর্থপূর্ণতা (Meaningfulness):** ব্র্যান্ড উপাদানগুলো বর্ণনামূলক বা প্ররোচিত বিষয়সহ যেকোন ধরণের অর্থ গ্রহণ করতে পারে। ব্র্যান্ড নামগুলো মানুষ, স্থান, প্রাণী, পশু, পাখি, বা অন্যান্য জিনিস বা বস্তুর উপর ভিত্তি করে হতে পারে। ব্র্যান্ড উপাদানটি কতটা অর্থপূর্ণ বা অর্থবহ, তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হল:

- ✓ পণ্য বা সেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে সাধারণ তথ্য: ব্র্যান্ড উপাদানটির কি বর্ণনামূলক কোনো অর্থ আছে এবং পণ্যের শ্রেণি, চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্য বা সরবরাহ করা সুবিধাগুলো সম্পর্কে সেটি কি কিছু পরামর্শ দেয়? কোন একটি ব্র্যান্ড উপাদানের উপর ভিত্তি করে একজন গ্রাহক ব্র্যান্ডের পণ্যের বিভাগটি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারার সম্ভাবনা কতটা? নির্দিষ্ট পণ্য বিভাগে ব্র্যান্ড উপাদানটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় কিনা?
- ✓ ব্র্যান্ডের বিশেষ গুণাবলী এবং সুবিধাগুলো সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য: ব্র্যান্ড উপাদানটির কি প্ররোচনামূলক অর্থ আছে এবং নির্দিষ্ট ধরণের পণ্য এবং এর মূল পয়েন্ট-অফ-ডিফারেন্স বা সুবিধাগুলো সম্পর্কে সেটি কি কিছু পরামর্শ দেয়? এটি কি পণ্যের কার্যকারিতার নির্দিষ্ট কিছু দিক বা ব্র্যান্ডটি কেমন ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেয়?

এই প্রথম বিষয়টি হলো ব্র্যান্ড সচেতনতা এবং সাবলীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ব্র্যান্ড ইমেজ এবং ব্র্যান্ডের অবস্থান গ্রহণের নির্ধারক।

**৩। পছন্দনীয়তা (Likability):** স্বতন্ত্র স্বরণযোগ্যতা এবং অর্থবহতার দিক থেকে গ্রাহকরা কি ব্র্যান্ড উপাদানটিকে নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় মনে করেন? এটা কি দৃশ্যত, মৌখিকভাবে বা অন্যান্য উপায়ে পছন্দনীয় হতে পারে? ব্র্যান্ড উপাদানগুলো সরাসরি পণ্যের সাথে সম্পর্কিত না হলেও কাল্পনিকভাবে সমৃদ্ধ এবং অন্তর্নিহিতভাবে মজাদার এবং আকর্ষণীয় হতে পারে।

স্বরণীয়, অর্থবহ এবং পছন্দনীয় ব্র্যান্ড উপাদানগুলো অনেক সুবিধা দেয় কারণ গ্রাহকেরা প্রায়শই পণ্য ক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বেশি তথ্য যাচাই বাছাই করেন না। বর্ণনামূলক এবং প্ররোচনামূলক উপাদান সচেতনতা তৈরি করতে এবং ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন ও ইক্যুইটিকে সংযুক্ত করতে বিপণন যোগাযোগের উপর থেকে চাপ কমিয়ে দেয়।

**৪। স্থানান্তরযোগ্যতা (Transferability):** ব্র্যান্ড উপাদানটি নতুন পণ্য বা ব্র্যান্ডের জন্য নতুন বাজারে ব্র্যান্ড ইক্যুইটিতে কী যোগ করে, স্থানান্তরযোগ্যতা তা পরিমাপ করে। এই মানদন্ডের বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে।

- ✓ প্রথমত, লাইন বা ক্যাটাগরি এক্সটেনশনের জন্য ব্র্যান্ড উপাদান কতটা উপযোগী? সাধারণভাবে, নামটি যত কম শ্রেণিনির্দিষ্ট হবে, তত সহজে এটি সেই শ্রেণির বাইরেও স্থানান্তর করা যেতে পারে। উদাহণস্বরুপ, Amazon এর কথা বলা যেতে পারে। অ্যামাজনকে একটি ব্র্যান্ড নাম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এটি দক্ষিণ আমেরিকার একটি বিশাল নদীকে বোঝায় এবং বৈচিত্র্যময় বিশাল পণ্য শ্রেনির একটি ব্র্যান্ড নাম হিসাবে এটি উপযুক্ত।
- ✓ দ্বিতীয়ত, ব্র্যান্ড উপাদানটি বিভিন্ন ভৌগলিক সীমানা এবং বাজার বিভাগ জুড়ে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি কতটা বৃদ্ধি করে? অনেকাংশে, এটি ব্র্যান্ড উপাদানের সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু এবং ভাষাগত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। যেমন - ExxonMobil এর মতো আপাত অর্থহীন, কৃত্রিম নামগুলোর একটি প্রধান সুবিধা হলো যে সেগুলোকে সহজেই অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা যায়।

এমনকি শীর্ষ বিপণনকারীরাও তাদের ব্র্যান্ডের নাম, স্লোগান এবং প্যাকেজগুলোকে অন্যান্য ভাষা এবং সংস্কৃতিতে বছরের পর বছর অনুবাদ করতে গিয়ে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন- মাইক্রোসফট লাটভিয়ায় তাদের ভিসতা অপারেটিং সিস্টেম চালু করার সময় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল, কারণ স্থানীয় ভাষায় ওই নামের অর্থ দাঁড়ায় "মুরগি" বা "নোংরা মহিলা"। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য, কোম্পানিগুলোকে একটি নতুন বাজারে ব্র্যান্ড চালু করার আগে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখতে তাদের ব্র্যান্ডের সমস্ত উপাদান পর্যালোচনা করতে হয়।

**৫। অভিযোজনযোগ্যতা (Adaptability):** ব্র্যান্ড উপাদানের জন্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা অভিযোজনযোগ্যতা। গ্রাহকদের মূল্যবোধ, পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা কিংবা মতামতের পরিবর্তনের কারণে বেশিরভাগ ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে অবশ্যই আধুনিকায়ন বা হালনাগাদ করতে হয়। ব্র্যান্ডটি যত বেশি নমনীয় হবে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে যত দ্রুত খাপ খাওয়ানোর উপযোগী হবে, সেটিকে আধুনিকায়ন করা ততবেশি সহজ হবে। যেমন- ব্র্যান্ডের লোগো এবং অক্ষরগুলোকে আরও আধুনিক, আকর্ষনীয় এবং প্রাসঙ্গিক দেখানোর জন্য এনসিসি ব্যাংক তাদের একটি নতুন লোগো ও স্লোগান চালু করেছে।

**৬। সুরক্ষাযোগ্যতা (Protectability):** ব্র্যান্ড উপাদান নির্ধারণ করার চূড়ান্ত বিবেচ্য বিষয় হল এর আইনি এবং প্রতিযোগিতামূলক সুরক্ষাযোগ্যতা । ব্র্যান্ডকে সুরক্ষিত রাখতে বিপণনকারীদের উচিত-

- ✓ আন্তর্জাতিকভাবে ও আইনগতভাবে সংরক্ষণযোগ্য ব্র্যান্ড উপাদান পছন্দ করা,
- ✓ উপযুক্ত আইনগত কাঠামোসহ ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করা, এবং
- ✓ অনুমোদনহীন প্রতিযোগিতামূলক বিধি-বিধান লংঘন থেকে ট্রেডমার্ককে জোরালোভাবে রক্ষা করা।

এসবের পাশাপাশি ব্র্যান্ডটি প্রতিযোগীদের হাত থেকে পুরোপুরি ভাবে সংরক্ষণযোগ্য কিনা, সেই বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। ব্র্যান্ড নাম, প্রতীক, স্লোগান, প্যাকেজিং বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যদি খুব সহজেই নকল করা যায়, তাহলে ব্র্যান্ডের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিপণনকারীদের উচিত সম্ভাব্য নকল এমনভাবে প্রতিরোধ করা যেন প্রতিযোগীরা ব্র্যান্ডের নিজস্ব উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে সহায়ক কোন পণ্য উৎপাদন করতে না পারে।

### ব্র্যান্ড উপাদান কেন পছন্দ করতে হয়?

## Reasons for Choosing Brand Elements

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার ভীড়ে নিজেকে আলাদা করার জন্য একটি অনন্য এবং স্মরণীয় ব্র্যান্ড পরিচয় তৈরি করা প্রতিটি কোম্পানির জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর সঠিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে যেকোন কোম্পানি একটি শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় ব্র্যান্ড উপস্থিতি গড়ে তুলতে পারে যা কোম্পানিটিকে তার গ্রাহকদের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। বিপণনকারীরা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্র্যান্ড উপাদানগুলো যেমন-ব্র্যান্ডের নাম, ইউআরএল, লোগো, প্রতীক বা চিহ্ন, চরিত্র, মুখপাত্র, স্লোগান, জিঙ্গেল, প্যাকেজ, সাইনেজ এবং রঙের স্কিম ইত্যাদিকে নির্ধারণ করে থাকেন। নিম্নে এমন কিছু কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

- ✓ ব্র্যান্ড উপাদানগুলো কোম্পানির দৃশ্যমান পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- ✓ একটি ব্র্যান্ড তৈরি করার সময় শক্তিশালী এবং সঙ্গতিপূর্ণ উপস্থিতি এবং পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। আর ব্র্যান্ডের উপাদান ব্র্যান্ডের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

- ✓ প্রতিটি উপাদান পরিষ্কার ব্র্যান্ড ধারণা বা উপলব্ধি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
- ✓ ব্র্যান্ডের উপাদানগুলো একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডকে অন্য ব্র্যান্ড থেকে স্বতন্ত্র্য ও অনন্য করে তোলে।
- ✓ নাম, লোগো কিংবা রঙের স্কিম থেকে শুরু করে টাইপোগ্রাফি আর স্লোগান পর্যন্ত প্রতিটি ব্র্যান্ড উপাদান একটি ব্র্যান্ডের দৃশ্যমান ভাষায় অবদান রাখে এবং ব্র্যান্ডটিকে স্বীকৃতিযোগ্য করে তোলে।
- ✓ প্রতিটি ব্র্যান্ড উপাদান কোম্পানির সামগ্রিক ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।
- ✓ ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর সফল বাস্তবায়ন কোম্পানি ও ব্র্যান্ডকে একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি তৈরি করতে সাহায্য করে।
- ✓ একটি ব্র্যান্ডের আবেগীয় দিকগুলো দৃশ্যমান উপস্থাপনার বাইরে গিয়ে গ্রাহকরা কীভাবে সেই ব্র্যান্ডকে অনুভব করেন এবং ব্র্যান্ডটির সম্পর্কে চিন্তা করেন তা নিয়ে কাজ করে। ব্র্যান্ডের উপাদানগুলো ব্র্যান্ড এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে একটি গভীর আবেগীয় সংযোগ তৈরি করে।

**সারসংক্ষেপ:**

ব্র্যান্ড উপাদান বলতে এমন কিছু ট্রেডমার্কযোগ্য উপাদানকে বুঝায় যা একটি ব্র্যান্ডকে অন্য ব্র্যান্ড থেকে আলাদা করে এবং এমন একটি স্বীকৃত প্রতীক বা পরিচিত প্রদান করে যা কোম্পানি বা পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ব্র্যান্ড উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে  ব্র্যান্ডের নাম, ইউআরএল, লোগো, প্রতীক বা চিহ্ন, চরিত্র, মুখপাত্র, স্লোগান, জিঙ্গেল, প্যাকেজিং, সাইনেজ এবং রঙের স্কিম ইত্যাদি। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে  উপাদানগুলোর স্মরণযোগ্যতা, অর্থপূর্ণতা, পছন্দযোগ্যতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতা বিবেচনা করে ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে নির্ধারণ করতে হয়। ব্র্যান্ড উপাদানগুলো ব্র্যান্ডের সচেতনতা বাড়াতে পারে, শক্তিশালী, অনুকূল এবং অনন্য ব্র্যান্ড এ্যাসোসিয়েশন গঠনে সহায়তা করতে পারে, ইতিবাচক ব্র্যান্ড রায় এবং অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, কোম্পানির দৃশ্যমান পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং ব্র্যান্ড ও এর গ্রাহকদের মধ্যে একটি গভীর আবেগীয় সংযোগ তৈরি করতে পারে।

# পাঠ-৬.২ ব্র্যান্ড নাম
# Brand Name

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্র্যান্ড নাম কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কার্যকর ব্র্যান্ড নামের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড নামের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

কোম্পানির ব্র্যান্ডিং শুরু হয় একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড নাম পছন্দ করার মাধ্যমে। ব্র্যান্ড নাম হলো ব্র্যান্ডের একটি অংশ যা অক্ষর, শব্দ বা সংখ্যা দ্বারা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যায়। ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা হিসেবে খেয়াল রাখতে হয় ব্র্যান্ড নামটি যথেষ্ট পরিমাণ ব্র্যান্ড সচেতনতা ও ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বা অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে কি না। অন্যদিকে, ব্র্যান্ড নামকরণের জন্য ধাপে ধাপে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে নামকরণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়, নতুন নাম সৃষ্টি করতে হয়, প্রাথমিক নাম যাচাই-বাছাই করতে হয়, প্রস্তাবিত নাম পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়, চূড়ান্ত নামের গবেষণা করতে হয় এবং সর্বশেষ নাম চূড়ান্ত করতে হয়। একটি আদর্শ ব্র্যান্ড নামকে স্বতন্ত্র হতে হয়, উচ্চারণ করতে, চিনতে এবং মনে রাখতে সহজ হতে হয়, এবং পণ্যের সুবিধা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট বার্তা তুলে ধরতে সক্ষম হতে হয়। কেননা ব্র্যান্ড নাম গ্রাহকদের মনে ব্র্যান্ডের প্রথম ইম্প্রেশন বা ছাপ তৈরি করে, স্মরণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতিকে উন্নত করে এবং ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানকে প্রকাশ করে।

## ব্র্যান্ড নাম কী?
## What is a Brand Name?

কোম্পানির ব্র্যান্ডিং একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়ে শুরু হয়। ব্র্যান্ড নামটি একটি কোম্পানির ব্যবসা এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগের প্রথম বিন্দু হিসেবে কাজ করে, কোম্পানি ও এর পণ্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে এবং গ্রাহক আচরণকে প্রভাবিত করে। ব্র্যান্ড নাম দিয়ে ব্র্যান্ডের পরিচয় ও কার্যকারিতার প্রকাশ ও প্রসার ঘটে।

ব্র্যান্ড নাম সম্পর্কে **Kevin Lane Keller** বলেন, "The brand name is a fundamentally important choice because it often captures the central theme or key associations of a product in a very compact and economical fashion. Brand names can be an extremely effective shorthand means of communication". অর্থাৎ, একটি ব্র্যান্ড নাম মৌলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পছন্দ কারণ প্রায়শই এটি একটি পণ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এবং মূল অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে খুব সংক্ষিপ্ত এবং মিতব্যয়ী উপায়ে প্রকাশ করে। ব্র্যান্ড নাম কার্যকর যোগাযোগের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মাধ্যম বা পদ্ধতি হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে **Bovee, Houston & Thill** বলেন "A brand name is the portion of a brand that can be expressed verbally, including letters, words or numbers". অর্থাৎ, ব্র্যান্ড নাম হলো ব্র্যান্ডের একটি অংশ যা অক্ষর, শব্দ বা সংখ্যা দ্বারা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ব্র্যান্ড নাম যেহেতু গ্রাহকদের মনে কোম্পানি বা পণ্য সম্পর্কে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্র্যান্ড নাম পছন্দ করতে হয়। যথাযথ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই ব্র্যান্ড নাম চূড়ান্ত করতে হয়। কেননা ব্র্যান্ড নাম পরিবর্তন করা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন একটি কাজ।

## ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়
## Factors to be Considered for Choosing Brand Name

কোন কোম্পানি বা ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ডিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো ব্র্যান্ড নাম। ব্র্যান্ড নাম কোম্পানির এবং ব্র্যান্ডের পরিচয় প্রকাশ করে। কোনো কোম্পানি তাদের কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার জন্য যে নাম প্রদান করে, তাকেই ব্র্যান্ড নাম বলে। ব্র্যান্ড

নামকে অনেক সময় বাণিজ্যিক নাম ও বলা হয়ে থাকে। ব্র্যান্ড নাম হলো পণ্য বা সেবার একটি অনন্য পরিচয়। এটি গ্রাহকদের মনে ব্র্যান্ড সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। কখনও কখনও কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাদের নামই ব্র্যান্ড নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন- মোটরগাড়ি ব্র্যান্ড "ফোর্ড" এর নাম এর নির্মাতা হেনরি ফোর্ডের নাম থেকে এসেছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানিগুলো ব্যাপক বাজার গবেষণার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের নাম চূড়ান্ত করে থাকে। যেহেতু গ্রাহকদের মনে পণ্যের সাথে ব্র্যান্ড নামটি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই কোন কোম্পানি চাইলেই খুব সহজে ব্র্যান্ড নাম পরিবর্তন করতে পারে না। ব্র্যান্ড নাম চূড়ান্তকরণের সময় দুইটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিতে হয়।

১। ব্র্যান্ড নামকরণের নির্দেশিকা (Brand Naming Guidelines)

২। ব্র্যান্ড নামকরণের প্রক্রিয়া (Brand Naming Procedures)

নিম্নে বিষয় দুইটি নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলোঃ

**১। ব্র্যান্ড নামকরণের নির্দেশিকা (Brand Naming Guidelines):** নতুন পণ্যের জন্য কার্যকর একটি ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করা বিপণন ব্যবস্থাপকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে ব্র্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামকরণের কাজটি তুলনামূলকভাবে কঠিন একটি কাজ। ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণের কাজটি একইসাথে বিজ্ঞানসম্মত এবং শৈল্পিক হতে হয়। ব্র্যান্ড নামকরণের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে পণ্যের প্রকৃতি, লক্ষ্যস্থিত বাজার, গ্রাহকের ধরণ, শিল্পের প্রবণতা, বাজার পরিস্থিতি এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এর পাশাপাশি, নামকরণের ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্যতা, অর্থপূর্ণতা, পছন্দনীয়তা, স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতা, এই ৬ টি সাধারণ মানদন্ডকেই বিবিচনায় নিতে হয়। ব্র্যান্ডের নাম বিভিন্ন রূপে আসতে পারে, যেমন- পণ্যের কার্যকারিতা ভিত্তিক, নির্দিষ্ট কোনও পণ্য বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক বা সম্পূর্ণ কৃত্রিম কোন নাম। তবে নামকরণের ক্ষেত্রে দেখতে হয় যে ব্র্যান্ড নামটি যথেষ্ট পরিমাণ ব্র্যান্ড সচেতনতা ও ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বা অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে কি না।

**(১) ব্র্যান্ড সচেতনতা (Brand Awareness):** গ্রাহক কোন পণ্য বা সেবার নাম কতটা জানে বা স্মরণ করতে পারে, তার পরিমাপই হলো ব্র্যান্ড সচেতনতা। এটি হলো কোন পণ্য বা সেবার প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ তৈরির প্রাথমিক স্তর। একজন গ্রাহক কোন পণ্য কিনবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ব্র্যান্ডের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড সচেতনতার গুরুত্ব সীমাহীন। সাধারণত যেসব ব্র্যান্ড নাম উচ্চারণ বা বানান করা সহজ, পরিচিত এবং অর্থপূর্ণ, এবং পৃথকীকৃত বা ভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং অনন্য, সেগুলো নিঃসন্দেহে ব্র্যান্ড সচেতনতা বাড়াতে পারে।

- ✓ **সহজসরল উচ্চারণ এবং বানান (Simplicity and Ease of Pronunciation and Spelling):** সহজ নাম স্মরণ রাখাও সহজ হয়। সরল নাম স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা ও ফিরিয়ে আনা সহজ। সহজে মনে রাখার জন্য বিপণনকারীরা তাই বড় নামকে ভেঙ্গে বা সংকুচিত করে সেগুলোকে ছোট করতে পারেন। যেমন- বছরের পর বছর ধরে কোকা কোলা "কোক" নামে পরিচিত। এর পাশাপাশি, বিপণনকারীরা ব্র্যান্ডের নাম সহজে উচ্চারণযোগ্য করার জন্য উচ্চারণে কষ্টকর এমন নাম এড়িয়ে চলতে পারেন। কঠিন উচ্চারণের ব্র্যান্ডের নাম উচ্চারণ জটিলতার কারণে গ্রাহকরা এড়িয়ে যেতে পারেন এবং এধরণের নামের প্রচার করার বেশ কঠিন।
- ✓ **পরিচিতি এবং অর্থবহতা (Familiarity and Meaningfulness):** ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিচিত এবং অর্থপূর্ণ নাম খুবই কার্যকর। ব্র্যান্ড নাম বাস্তব বা অবাস্তব যাই হোক না কেন, তা যদি প্রয়োগযোগ্য, রূপক বা গ্রাহকের জানাশোনা হয়, তবে সে ব্র্যান্ড বাজারে বেশি পরিচিতি পায় এবং গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন করে বেশি। ফলে গ্রাহকরা তুলনামূলক কম পরিচিত ব্র্যান্ডের চেয়ে সেসব ব্র্যান্ডকেই বেছে নেবেন। তাই বিভিন্ন মানুষ, প্রাণী, পশু, পাখি, বস্তু, প্রতীক বা পরিচিত জড় বস্তুর নাম ব্র্যান্ড নাম হিসেবে ব্যবহার করা বেশ স্বীকৃত একটি পদ্ধতি।
- ✓ **পৃথকীকৃত, স্বতন্ত্র এবং অনন্য (Differentiated, Distinctive, and Unique):** যদিওবা একটি সরল, উচ্চারণে সহজ, পরিচিত এবং অর্থপূর্ণ ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করা গ্রাহকদের ব্র্যান্ডটিকে মনে রাখার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে ব্র্যান্ড স্বীকৃতি বাড়াতে ব্র্যান্ড নামগুলোকে পৃথকীকৃত বা ভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং একেবারে অনন্য হওয়া উচিত। স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড নামগুলো গ্রাহকদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য স্মৃতিতে ধরে রাখার কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। একটি ব্র্যান্ড নাম স্বতন্ত্র হতে পারে কারণ এটি স্বভাবগতভাবেই অনন্য, কিংবা নামটি সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্র্যান্ডের মধ্যে অনন্য। যেমন-Apple স্মার্টফোন কোম্পানিগুলোর মধ্যে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র ও অনন্য ব্র্যান্ড পরিচিতি তৈরি করেছে এবং গ্রাহকদের মুখে মুখে Apple ব্র্যান্ডের কথা শোনা যায়।

**(২) ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন (Brand Associations):** ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বা ব্র্যান্ড অনুষঙ্গ হলো ব্র্যান্ড এবং গ্রাহকের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগগত, মানসিক এবং আচরণগত একধরণের সম্পর্ক। এটি কেবল পণ্য বা সেবা বিক্রি করা নয়, বরং তার চেয়েও বেশি কিছুকে ইঙ্গিত করে। ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন গ্রাহকদের সাথে টেকসই, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি চলমান প্রক্রিয়া। ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে তাই কোম্পানিকে যথেষ্ট সময় এবং প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করতে হয়। গ্রাহকের চাহিদা, পছন্দ এবং অনুরক্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিবাচক ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বজায় রাখার জন্য কোম্পানিকে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সফলতার জন্য শক্তিশালী ও ইতিবাচক ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অপরিহার্য।

ব্র্যান্ড নাম যেহেতু ব্র্যান্ড যোগাযোগের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে, ব্র্যান্ডের নামটিকে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার একটি উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে যা ব্র্যান্ডটির পণ্যের পজিশনিং বা অবস্থান তৈরি করে। বিপণনকারীরা সাধারণত শব্দের অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম অংশ বা মরফিমস এর সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে পদ্ধতিগতভাবে ব্র্যান্ডের নামগুলো উদ্ভাবন করে থাকেন। তবে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, যেমন- পৃথক অক্ষর, অক্ষরের শব্দ এবং হরফ ইত্যাদিও ব্র্যান্ড নামের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন- গ্রাহকরা প্রায়শই বিশ্বাস করেন যে, কোন কাপড়ের লন্ড্রি ডিটারজেন্টকে ব্র্যান্ড নাম দেওয়ার জন্য যদি "Circle" এর মত নিরপেক্ষ নামের চেয়ে "Blossom" মত একটি নাম দেওয়া হয়, তাহলে তা ব্র্যান্ড নামটিতে একধরণের "Fresh Scent" যুক্ত করতে পারে। তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে পর্যাপ্ত সময় এবং সঠিক বিপণন গবেষণা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণ করলে সেটি সর্বাধিক ফলপ্রসু হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

**২। ব্র্যান্ড নামকরণের প্রক্রিয়া (Brand Naming Procedures):** ব্র্যান্ড নামকরণ হলো কোন কোম্পানি, পণ্য বা সেবার জন্য একটি কার্যকর নাম নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। একটি কার্যকর ব্র্যান্ড নাম বাজারে ব্র্যান্ডের ইমেজকে শক্তিশালী করে এবং শক্তিশালী ইমেজের ব্র্যান্ডগুলো গ্রাহকদের পছন্দকে প্রভাবিত করতে এবং একটি প্রিমিয়াম সুবিধা দিতে পারে। ব্র্যান্ডের নামকরণের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা, চিন্তা শক্তি ও ট্রেডমার্ক নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন বিপণন বিশেষজ্ঞগণ ব্র্যান্ড নামকরণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ব্র্যান্ড নামকরণের প্রক্রিয়ায় নিম্নোলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

**(১) উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Define Objectives):** ব্র্যান্ড নামকরণ করার আগে নামকরণের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হয়। ব্র্যান্ড নামকরণের উদ্দেশ্যগুলোকে ছয়টি সাধারণ মানদন্ড যেমন- স্মরণযোগ্যতা, অর্থপূর্ণতা, পছন্দযোগ্যতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুরক্ষাযোগ্যতার দিক থেকে নির্ধারণ করতে হবে এবং বিশেষ করে ব্র্যান্ডটি কী অর্থ বহন করে, সংজ্ঞায়িত করতে হবে। নামকরণের উদ্দেশ্য নির্ধারণে কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং সোপানের মধ্যে ব্র্যান্ডের ভূমিকা এবং এটি অন্যান্য ব্র্যান্ড এবং পণ্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত, তা বিবেচনা করতে হবে।

**(২) নতুন নাম সৃষ্টি করা (Generate Names):** ব্র্যান্ডিং কৌশলের সাথে সমন্বয় করে যতগুলো সম্ভব ব্র্যান্ড নাম তৈরি করতে হবে। নামগুলোকে অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী উৎস থেকে নিলে তা হালনাগাদ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নতুন নাম সংগ্রহ করার সম্ভাব্য উৎস হতে পারে-

- ✓ কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ,
- ✓ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী,
- ✓ খুচরা বিক্রেতা,
- ✓ সরবরাহকারী,
- ✓ অভিজ্ঞ গ্রাহক,
- ✓ সম্ভাব্য গ্রাহক,
- ✓ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা, এবং
- ✓ পেশাদার নাম পরামর্শদাতা কোম্পানি ইত্যাদি।

এই ধাপে হাজার হাজার সম্ভাব্য নতুন নাম তৈরি হতে পারে।

**(৩) প্রাথমিক নাম বাছাই করা (Screen Initial Candidates):** এই ধাপে বিপণন এবং ব্র্যান্ড নামকরণের উদ্দেশ্যের বিপরীত সকল নাম বাদ দিতে হবে। নাম বাছাইয়ের জন্য কান্ডজ্ঞান ব্যবহার করে একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রাথমিক নাম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শ্রেণির নামগুলোকে পরিহার করা উচিত-

- ✓ যে নামগুলোর অনিচ্ছাকৃত দ্বিঅর্থবোধকতা রয়েছে,
- ✓ যে নামগুলো ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে,
- ✓ যে নামগুলো বিদ্যমান নামের খুব কাছাকাছি,
- ✓ যে নামগুলো ব্র্যান্ড পজিশনিং এর ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বিপরীত অবস্থানে আছে,
- ✓ যে নামগুলোর সুষ্পষ্ট আইনি জটিলতা রয়েছে ইত্যাদি।

**(৪) প্রস্তাবিত নাম পরীক্ষানিরীক্ষা করা (Studz Candidate Names):** এই ধাপে এসে সম্ভাব্য নামের সংখ্যা ৫ থেকে ১০ টিতে নামিয়ে এনে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলতে হয়। এরপর এই পাঁচ থেকে দশটি নাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। গ্রাহক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিটি নাম সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করার এই পদক্ষেপটি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তাই গ্রাহক গবেষণায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করার আগে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে নামগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হয়।

**(৫) চূড়ান্ত নামের গবেষণা (Research the Final Candidates):** এই ধাপে এসে অবশিষ্ট নামগুলোর স্মরণযোগ্যতা এবং অর্থপূর্ণতা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা নিশ্চিত করতে গ্রাহক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি, প্রতিটি সম্ভাব্য নামের জন্য ডোমেইন নাম, ট্রেড মার্ক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সহজলভ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। কোন আইনি বা ট্রেডমার্ক সমস্যা আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক ফার্ম আছে যারা প্রকৃত বিপণন কার্যক্রমের অনুকরণ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য নামগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা গবেষণা করে দেখে। সে ক্ষেত্রে বিপণনকারী গ্রাহকদের পণ্য এবং এর প্যাকেজিং, মূল্য বা প্রচার দেখাতে পারে যাতে তারা ব্র্যান্ড নামের যুক্তি এবং এটি কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা বুঝতে পারে। সেই সাথে বিপণনকারীরা আঞ্চলিক বা জাতিগত আবেদনের পার্থক্য অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেও গ্রাহক জরিপ করতে পারেন। এছাড়াও তাদের ব্র্যান্ডের নামের সাথে বারবার এক্সপোজারের প্রভাবগুলোও অধ্যায়ন করতে হবে।

**(৬) নাম চূড়ান্তকরণ (Select the Final Name):** এই ধাপে এস সহজলভ্যতা, স্বতন্ত্রতা সহ পূর্ববর্তী ধাপে প্রাপ্ত সকল তথ্য ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পরিমার্জিত তালিকা থোকে চূড়ান্ত নামটি নির্ধারণ করতে হবে। কোম্পানি ব্যবস্থাপনার উচিত এমন নাম নির্বাচন করা যা কোম্পানির ব্র্যান্ডিং এবং বিপণনের উদ্দেশ্যগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রা দিতে পারে। নাম চূড়ান্ত হয়ে গেলে কোম্পানি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এটিকে আনুষ্ঠনিকভাবে নিবন্ধন করে।
ভাবেই বিপণনকারীরা বিভিন্ন ধাপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে ব্র্যান্ডের একটি নাম চূড়ান্ত করে যা ব্র্যান্ডের ইমেজ ও সচেতনতা বাড়িয়ে শক্তিশালী বাজার অবস্থান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে থাকে।

### কার্যকর ব্র্যান্ড নামের গুণাবলী

## Qualities of an Effective Brand Name

একটি ব্র্যান্ড নামের সফলতার জন্য এর মধ্যে কিছু গুণাবলী থাকতে হয়। **Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders & Veronica Wong** কার্যকর ব্র্যান্ড নামের কাম্য কিছু গুণাবলীর কথা বলেছেন। কার্যকর ব্র্যান্ড নামের গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১। এটি পণ্যের সুবিধা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরবে। যেমন- ক্লিনেক্স (টিস্যু পেপার) নাম থেকে এর পরিষ্কারক গুণের একটা ধারণা পাওয়া যায়।
২। এটি উচ্চারণ করতে, চিনতে এবং মনে রাখতে সহজ হওয়া উচিত। সংক্ষিপ্ত এবং সহজসরল নাম যেমন- ডাভ (সাবান), লাক্স (সাবান), নোকিয়া (মোবাইল ফোন) স্মৃতিতে ধরে রাখা ও প্রয়োজনে মনে করা সহজ।
৩। ব্র্যান্ডের নামটি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। যেমন- শেল, কোডাক, ভার্জিন ইত্যাদি নাম একেবারেই স্বতন্ত্র।
৪। নামটি বিদেশী ভাষায় সহজে এবং অর্থপূর্ণ উপায়ে অনুবাদ করা উচিত। একেক ভাষায় যদি নামের অর্থ একেকরকম হয়, তবে ব্র্যান্ডটি বিপদে পড়ে যেতে পারে। এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আমরা ইতোমধ্যেই করেছি।

৫। এটি নিবন্ধন এবং আইনি সুরক্ষায় সুরক্ষিত হওয়া উচিত। একটি ব্র্যান্ড নাম যদি বিদ্যমান ব্র্যান্ডের নামগুলোকে নকল বা লঙ্ঘন করে, তবে নাম নিবন্ধিত করা যাবে না। এছাড়াও, শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বা পরামর্শমূলক ব্র্যান্ড নামগুলোও অরক্ষিত হতে পারে।

## ব্র্যান্ড নামের গুরুত্ব

## Importance of Brand Name

ব্র্যান্ডিং একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়ে শুরু হয়। ব্র্যান্ডের নামটি একটি ব্যবসা এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। ব্র্যান্ড নাম গ্রাহক সচেতনতা বাড়ায়, ব্র্যান্ডের ইমেজ বৃদ্ধি করে, এবং গ্রাহক আচরণকে প্রভাবিত করে। একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডের নাম বেছে নেওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা নিম্নবর্ণিত কারণ গুলো থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

- ✓ প্রথম ইম্প্রেশন বা ছাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড নাম একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রথম ছাপ তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতার জন্য ইতিবাচক সুর যোগ করে।
- ✓ স্মরণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতিকে উন্নত করে। একটি অনন্য ব্র্যান্ড নাম মনে রাখা সহজ। একটি স্মরণীয় নাম বেছে নেওয়ার ফলে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় গ্রাহকদের ব্র্যান্ডটি স্মরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- ✓ পার্থক্য তৈরি করে দিতে পারে। এমন একটি নাম চূড়ান্ত করতে হবে যা কোম্পানির ব্যবসাকে প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা হতে সাহায্য করে।
- ✓ ব্র্যান্ডের মানগুলোর সাথে সারিবদ্ধকরণ করে। ব্র্যান্ডের নামটি কোম্পানির মান, মিশন এবং সামগ্রিক ব্র্যান্ড কৌশলের সাথে সারিবদ্ধ হওয়া উচিত।
- ✓ ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্ব এবং অবস্থানকে প্রকাশ করে। সঠিক নামটি একটি ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারে এবং তা উদ্ভাবন, নির্ভরযোগ্যতা বা বন্ধুত্বের পরিচয় বহন করে।
- ✓ বিশ্বব্যাপী আবেদন থাকে। একটি কার্যকর নাম উচ্চারণে সহজ, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন ভাষা ও অঞ্চলে নেতিবাচক অর্থ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত যাতে আন্তর্জাতিকভাবে মসৃণভাবে বিস্তার লাভ করা যায়।

যুক্তরাজ্যের গবেষণা সংস্থা মিলওয়ার্ড ব্রাউন একটি সমীক্ষা চালিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে, একটি ব্র্যান্ডের নাম পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপনের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্র্যান্ডটির বিক্রি ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে এবং নতুন ব্র্যান্ডের ইমেজ আগেরটির মতো শক্তিশালী নাও হতে পারে। সুতরাং, কোম্পানিগুলোর কাছে একটি কার্যকর ব্র্যান্ড নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**সারসংক্ষেপ:**

ব্র্যান্ড নাম হলো কোম্পানির পণ্য বা সেবার একটি অনন্য পরিচয়। কোনো কোম্পানি তাদের কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার জন্য যে নাম প্রদান করে, তাকেই ব্র্যান্ড নাম বলে। ব্র্যান্ড নামকে অনেক সময় বাণিজ্যিক নাম ও বলা হয়ে থাকে। ব্র্যান্ড নাম চূড়ান্তকরণের সময় দুইটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিতে হয়। প্রথমত, ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা হিসেবে খেয়াল রাখতে হয় ব্র্যান্ড নামটি যথেষ্ট পরিমাণ ব্র্যান্ড সচেতনতা ও ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বা অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে কি না। দ্বিতীয়ত, ব্র্যান্ড নামকরণের জন্য ধাপে ধাপে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে নামকরণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়, নতুন নাম সৃষ্টি করতে হয়, প্রাথমিক নাম যাচাই-বাছাই করতে হয়, প্রস্তাবিত নাম পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়, চূড়ান্ত নামের গবেষণা করতে হয় এবং সর্বশেষ একটি নাম চূড়ান্ত করতে হয়। একটি আদর্শ ব্র্যান্ড নামকে স্বতন্ত্র হতে হয়, উচ্চারণ করতে, চিনতে এবং মনে রাখতে সহজ হতে হয়, পণ্যের সুবিধা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট বার্তা তুলে ধরতে সক্ষম হতে হয় এবং নিবন্ধন ও আইনি সুরক্ষায় সুরক্ষিত হতে হয়। একটি অনন্য ব্র্যান্ড নাম গ্রাহকদের মনে ব্র্যান্ডের প্রথম ইম্প্রেশন বা ছাপ তৈরি করে, স্মরণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতিকে উন্নত করে, ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানকে প্রকাশ করে এবং বিশ্বব্যাপী আবেদন তৈরি করে।

# পাঠ-৬.৩ ইউআরএল, লোগো এবং প্রতীক
# URL, Logos and Symbols

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ইউআরএল সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইউআরএল এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লোগো এবং প্রতীক কাকে বলে তা জানতে পারবেন;
- লোগো এবং প্রতীকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ইউআরএল (URL) বলতে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর (Uniform Resource Locator) কে বুঝায়, যা একটি ওয়েব পেজ বা ইন্টারনেটের কোনো রিসোর্সের ঠিকানা বা অভিন্ন অবস্থানকে নির্দেশ করে। ইউআরএলকে সংক্ষেপে ওয়েব ঠিকানাও বলা হয়ে থাকে। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ইউআরএল ব্র্যান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধি করে, ভালো এসইও প্রভাব তৈরি করে, বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, সহজ শেয়ারিং সুবিধা দেয় এবং ব্যবহারকারীকে উন্নত ব্র্যাউজিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ইউআরএল এর মতোই লোগো এবং প্রতীকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যান্ড নামের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের সনাক্তকরণের চিহ্ন হিসেবে সাধারণত লোগো এবং প্রতীক ব্যবহার করা হয়। যেমন-কোকা-কোলা, ডানহিল, মার্সিডিজ বেঞ্জ, অ্যাপল, কিটক্যাট ইত্যাদি ব্র্যান্ডের লোগো এবং প্রতীকগুলো গ্রাহকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। লোগো এবং প্রতীক ব্র্যান্ডকে সহজে শনাক্ত করতে সাহায্য করে, ব্র্যান্ডের প্রথম ছাপ তৈরি, ব্র্যান্ড পরিচয় এবং পার্থক্যকরণে সাহায্য করে, এবং ব্র্যান্ডকে প্রয়োজনীয় অভিযোজ্যতা দেয়।

## ইউআরএল কী?
## What is URL?

ইউআরএল (URL) এর পুর্ণরূপ হলো ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর (Uniform Resource Locator), যা একটি ওয়েব পেজ বা ইন্টারনেটের কোনো রিসোর্সের ঠিকানা বা অভিন্ন অবস্থানকে কে বোঝায়। ইউআরএল এর সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে কোনো ওয়েবসাইট বা রিসোর্সে প্রবেশ করা যায়।

ইউআরএলকে সংক্ষেপে ওয়েব ঠিকানাও বলা হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ব্র্যান্ডের বিষয়ে বা তার নামের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যা কোম্পানিকে ইন্টারনেটে শেয়ার করা সেই ব্র্যান্ড বা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্ত করে থাকে। ইউআরএলকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে **Kevin Lane Keller** বলেন, “URLs (uniform resource locators) specify locations of pages on the Web and are also commonly referred to as domain names.” অর্থাৎ, ইউআরএল (ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার) মূলত ইন্টারনেটে ওয়েবপেজের নির্দিষ্ট অবস্থানকে নির্দেশ করে এবং একে সাধারণত ডোমেন নামও বলা হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট ইউআরএল এর মালিক হতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইউআরএলটি নিবন্ধন করতে হবে এবং এই ডোমেন নামের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভর ব্র্যান্ডিং কৌশলের অংশ হিসেবে কোম্পানীগুলোর আবেদনের কারণে বর্তমানে নিবন্ধিত ইউআরএলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউআরএল হিসেবে পরিচিত প্রায় প্রতিটি শব্দই ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হয়ে গেছে এবং ইংরেজি অভিধানের প্রায় সমস্ত শব্দ বা প্রতি তিনটি-অক্ষরের সংমিশ্রণ ইউআরএল হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে গেছে। যদি কোন কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডের জন্য ওয়েবসাইট রাখতে চায়, তবে নিবন্ধিত ইউআরএলগুলোর এই বিশাল পরিমাণ তাই কোম্পানিগুলোকে নতুন ব্র্যান্ডের জন্য নতুন উদ্ভাবিত শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করে। যেমন- যখন Andersen Consulting তার নতুন নাম নির্বাচন করেছিল, তখন এটি আংশিকভাবে উদ্ভাবিত "Accenture" শব্দটি বেছে নিয়েছিল কারণ www.accenture.com ইউআরএলটি নিবন্ধিত ছিল না।

## ইউআরএল এর গুরুত্ব
## Importance of URL

বর্তমান তীব্র প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থায়, একটি ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করা একটি ইউআরএল বা ডোমেন নাম নির্বাচন করার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উপরন্তু, ইউআরএল হিসেবে উদ্ভাবিত শব্দ এবং বাক্যাংশগুলোর অত্যন্ত উচ্চ জনপ্রিয়তা

দেখে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে কেন ২০০০ সালে উদ্ভাবিত প্রায় সমস্ত মৌলিক ইংরেজি শব্দের প্রায় ৯৮% ই নিবন্ধিত ডোমেন নামগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইন্টারনেটে কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ড পেজ তৈরির জন্য এমন ব্র্যান্ড নাম তৈরি করতে বাধ্য হয় যার ডোমেন নাম এখনও নেওয়া হয়নি।

একটি ব্র্যান্ড নাম এবং অনুরূপ একটি ইউআরএল বা ডোমেন নামের জন্য সাধারণত ছন্দবদ্ধ এবং সুন্দর শব্দের নামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কেননা এরূপ নাম বা ডোমেনটি উচ্চারণ করা সহজ হয় এবং ইন্টারনেটে ডোমেনটি মনে রাখা এবং খুঁজে পাওয়াও সহজ হয়। ইউআরএল বা ডোমেন নাম হিসেবে এমন নাম চূড়ান্ত করতে, বিপণন বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার কথা বলেন:

- ✓ **অনুপ্রাস (Alliteration):** যেখানে প্রতিটি শব্দের প্রারম্ভে ব্যঞ্জনবর্ণের পুনরাবত্তি ঘটে, যেমন- Coca-Cola, Kit-Kat, Tik-Tok ইত্যাদি ।
- ✓ **স্বরানুপ্রাস (Assonance):** যেখানে স্বরবর্ণের পুনরাবত্তি লক্ষ্য করা যায়, যেমন- Ramada, Arawak, Consonance ইত্যাদি।

তবে একটি ইউআরএল এর জন্য একটি উদ্ভাবিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ও বানানের সহজলভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইউআরএল এর শুধু একটি অক্ষরের কমবেশি বা ত্রুটি গ্রাহকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ওয়েবসাইটে নিয়ে যেতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে ব্র্যান্ডের ধারণাকে আরও খারাপ করতে পারে। তাই ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইউআরএল পছন্দ করতে হয়। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ইউআরএল এর কাজ হলো:

**১। পরিচিতি বৃদ্ধি (Increased Identity):** একটি সহজ-সরল এবং মনে রাখার মতো ইউআরএল ব্র্যান্ডকে সহজেই শনাক্তযোগ্য করে তোলে।

**২। ভালো এসইও প্রভাব (Good SEO Impact):** উপযুক্ত কিওয়ার্ড সমৃদ্ধ ইউআরএল, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশনে (SEO) সহায়তা করে। ফলে গ্রাহক অনুসন্ধানের সময় সার্চ রেজাল্টে ভালো বা শুরুর দিকের স্থান পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

**৩। বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি (Increased Credibility):** পেশাদার এবং পরিষ্কার ইউআরএল, ব্যবহারকারীদের মাঝে ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।

**৪। সহজ শেয়ারিং (Easy Sharing):** ছোট এবং সহজ ইউআরএল গুলো সহজেই বিভিন্ন মাধ্যমে শেয়ার করা যায়, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য প্লাটফর্মে ব্র্যান্ডের প্রচার বাড়াতে সাহায্য করে।

**৫। ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করা (Improved User Experience):** একটি ভালোভাবে গঠিত ইউআরএল গ্রাহক এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সেই ওয়েবসাইটে নেভিগেট করা সহজ করে তোলে।

এসব কারনেই কোম্পানিকে ব্র্যান্ডের জন্য এমন একটি ইউআরএল পছন্দ করতে হয় যা তার ব্র্যান্ড নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। একটি ভালো ইউআরএল ব্র্যান্ডের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে।

## লোগো এবং প্রতীক বলতে কী বুঝায়?

## What is meant by Logos and Symbols?

ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে লোগো এবং প্রতীক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যান্ড নামের পাশাপাশি সাধারণত ব্র্যান্ডের সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে লোগো এবং প্রতীক ব্যবহার করা হয়। যেমন-কোকা-কোলা, ডানহিল, মার্সিডিজ বেঞ্জ, অ্যাপল, কিটক্যাট ইত্যাদি ব্র্যান্ডের লোগো এবং প্রতীকগুলো বেশ জনপ্রিয়। বহু ব্র্যান্ডের লোগো এবং প্রতীকের মাধ্যমেই সেই কোম্পানির পণ্যের গুনগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আনুষাঙ্গিক সুবিধা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

বিপণন ব্যবস্থাপকগণ যদিওবা ব্র্যান্ডের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্র্যান্ড নামকে নির্দেশ করে থাকেন, তারপরও দৃশ্যমান উপাদান হিসেবে লোগো এবং প্রতীক ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ও ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। লোগো বিশেষভাবে লেখা কর্পোরেট নাম বা ট্রেডমার্ক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র প্রকৃতির বিমুর্ত নকশাও হতে পারে।

শক্তিশালী শব্দ মার্ক বিশিষ্ট কর্পোরেট নাম চিহ্নিত লোগোর উদাহরণ হিসেবে কোকা-কোলা, ডানহিল, কিটক্যাট ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। আবার শব্দমার্ক বিহীন বিমুর্ত লোগোর উদাহরণ হিসেবে মার্সিডিজ স্টার, রোলেক্স ক্রাউন, নাইকি

সুউশ, অলিম্পিক রিংস ইত্যাদি। আর এ ধরনের শব্দহীন লোগোকেই প্রতীক বলা হয়। তবে অনেক লোগো আছে যেগুলো শব্দ মার্ক যুক্ত এবং শব্দহীন বিমুর্ত নকশার মাঝামাঝি অবস্থান করে যেমন- রেড ক্রিসেন্ট, অ্যাপল ইত্যাদি ব্র্যান্ডের লোগো।

### লোগো এবং প্রতীকের গুরুত্ব

## Importance of Logos and Symbols

লোগো এবং প্রতীক হচ্ছে একটি ব্র্যান্ডের দৃশ্যমান উপস্থাপনার একটি মাধ্যম। সুন্দরভাবে নকশা করা একটি লোগো ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং প্রতিশ্রুতি প্রকাশের খুব সংক্ষিপ্ত একটা উপায় হিসেবে কাজ করে। লোগোকে তাই অনন্য এবং তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তযোগ্য হতে হয় যেন এটি নিজেই সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের সমার্থক হয়ে উঠতে পারে। প্রতীকগুলো সাধারণত লোগোর পরিপূরক হয়ে এবং একটি সুসংহত ও একীভূত দৃশ্যমান পরিচয় তৈরি করে। নিম্নে লোগো এবং প্রতীকের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১। **সহজেই শনাক্ত করা যায় (Easily Recognizable):** লোগো এবং প্রতীক গুলোকে সাধারণত সহজেই চেনা যায়। ফলে সহজে পণ্য খুঁজে বের করার জন্য এগুলো একটি ভালো উপায় হতে পারে।

২। **প্রথম ছাপ তৈরি (Creation of First Impression):** লোগো এবং প্রতীক গ্রাহকদের উপর একটি স্মরণীয় প্রথম ছাপ তৈরি করতে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং একটি ব্র্যান্ডের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। **ব্র্যান্ড পরিচয় এবং পার্থক্যকরণ (Brand Identification and Differentiation):** লোগো এবং প্রতীক গ্রাহকদের ব্র্যান্ডের সারমর্ম এবং মূল্যবোধ গুলোকে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করে ব্র্যান্ড গুলোকে পরিচিতি দিতে, বাজারের ভীড়ে শনাক্ত করতে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করতে সহায়তা করে।

৪। **বহুমুখিতা (Versatility):** লোগো এবং প্রতীকের আরেকটি ব্র্যান্ডিং সুবিধা হলো এর বহুমুখিতা। যেহেতু এগুলো সাধারণত লিখিত আকারে আসে, তাই যে কোনো শ্রেণির পণ্য বা সংস্কৃতি বরাবর এদের স্থানান্তরিত করা যায়। যেমন- পণ্যের উপর ব্যাপকভিত্তিক পরিচিত উপ-ব্র্যান্ডের অনুমোদনের জন্য অনেক সময় কর্পোরেট ব্র্যান্ড উন্নয়ন করা হয়।

৫। **পূর্ণ ব্র্যান্ড নামের বিকল্প (Alternative to Full Brand Name):** অনেক সময় ব্র্যান্ডের পূর্ণ নাম অনেক বড় হয়। তখন পূর্ণ ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করতে সমস্যা হলে বিমূর্ত লোগো এবং প্রতীকের ব্যবহার করাই সুবিধাজনক হয়। যেমন- ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি তাদের প্রতিষ্ঠানের লোগো হিসাবে আয়তাকার প্রতীক ব্যবহার করে। ব্যাংকের নামটি বেশ দীর্ঘ হওয়ার কারণে সংক্ষিপ্ত এই লোগোটি ব্যংকটির শনাক্তকরণ ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৬। **সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Shortened Version):** লোগোকে অনেক সময় কোম্পানির নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- আইবিএম এর লোগো ওইগ কোম্পানির পূর্ণ নাম International Business Machines এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণকেই নির্দেশ করে।

৭। **সহজ অভিযোজ্যতা (Easy Adaptability):** লোগো এবং প্রতীকগুলো ব্র্যান্ড নামের মতো অনমনীয় নয়। যুগোপযোগী হওয়ার জন্য এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লোগো এবং প্রতীকে সহজেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা যায়। তবে লোগো এবং প্রতীক পরিবর্তন করা বেশ ব্যয়বহুল।

পরিশেষে বলা যায়, লোগো এবং প্রতীকের সাহায্যে গ্রাহকরা সহজেই ব্র্যান্ডকে চিনতে পারে এবং ব্র্যান্ড স্বীকৃতি, পার্থক্য ও মূল্যবোধের পরিষ্কার ধারনা পায় যা গ্রাহকদের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং ব্র্যান্ডের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

**সারসংক্ষেপঃ**

ইউআরএল (URL) বলতে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর (Uniform Resource Locator) কে বুঝায়, যা মূলত ইন্টারনেটে ওয়েবপেজের নির্দিষ্ট অবস্থানকে নির্দেশ করে এবং একে সাধারণত ডোমেন নামও বলা হয়ে থাকে। ইউআরএলকে অনেকেই ওয়েব ঠিকানাও বলে থাকেন। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ইউআরএল ব্র্যান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধি করে, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশনে সহায়তা করে, বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, সহজ শেয়ারিং সুবিধা দেয় এবং ব্যবহারকারীকে উন্নত ব্র্যাউজিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ইউআরএল এর মতোই লোগো এবং প্রতীকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যান্ড নামের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের সনাক্তকরণের দৃশ্যমান উপাদান হিসেবে লোগো এবং প্রতীক ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ও ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। লোগো এবং প্রতীক ব্র্যান্ডকে সহজে শনাক্ত করতে সাহায্য করে, ব্র্যান্ডের প্রথম ছাপ তৈরি, ব্র্যান্ড পরিচয় এবং পার্থক্যকরণে সাহায্য করে, ব্র্যান্ডকে প্রয়োজনীয় অভিযোজ্যতা দেয়, পূর্ণ ব্র্যান্ড নামের বিকল্প হিসেবে কাজ করে এবং ব্র্যান্ড নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

# পাঠ-৬.৪ ব্র্যান্ড চরিত্র, স্লোগান এবং ঝংকার
# Brand Characters, Slogans and Jingles

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ড চরিত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড চরিত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্লোগান বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- স্লোগানের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঝংকার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ঝংকারের সুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্র্যান্ড চরিত্র দ্বারা মানুষের বা বাস্তব জীবনের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এমন বিশেষ ধরণের প্রতীককে বুঝায় যা ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে। ব্র্যান্ড চরিত্র ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে, ব্র্যান্ড সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে, বাজারে কোম্পানির ব্র্যান্ডের ভালো অবস্থান তৈরি করে এবং ব্র্যান্ড পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। স্লোগান হলো মনোযোগ আকর্ষণকারী ছোট বাক্যাংশ যা ব্র্যান্ড সম্পর্কে বর্ণনামূলক বা প্ররোচনামূলক তথ্য প্রদান করে। স্লোগানগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ব্র্যান্ডের দিকে গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাৎক্ষণিকভাবে বিপণন প্রচারাভিযানগুলোতে বাড়তি গতি আনে, কোম্পানির ব্র্যান্ড বা পণ্য ও সেবাগুলোকে দীর্ঘসময় স্মরণ রাখতে সহায়তা করে এবং ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। জিঙ্গেল বা ঝংকার হলো একটি ছোট সুর বা গান যা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ব্র্যান্ডের সাথে গ্রাহকের আবেগীয় সংযোগ তৈরি করে, ব্র্যান্ড মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়, ব্র্যান্ডকে পৃথক করে তোলে এবং অনেক সময় ব্র্যান্ড নামের সমার্থক হিসেবে কাজ করে।

## ব্র্যান্ড চরিত্র বলতে কী বুঝায়?
## What is meant by Brand Characters?

ব্র্যান্ড চরিত্র হলো একটি বিশেষ ধরনের ব্র্যান্ড প্রতীক যা মানুষের বা বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় এমন কোন বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে এবং একটি ব্যক্তিত্ব তৈরি করে যা ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই চরিত্রগুলো ব্র্যান্ডকে গ্রাহকদের সাথে আবেগঘন স্তরে সংযুক্ত হতে এবং ব্র্যান্ডকে আরও প্রাসঙ্গিক ও স্মরণীয় করে তুলতে তৈরি করা হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Characters represent a special type of brand symbol—one that takes on human or real-life characteristics." অর্থাৎ, ব্র্যান্ড চরিত্র দ্বারা মানুষের বা বাস্তব জীবনের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এমন বিশেষ ধরণের প্রতীককে বুঝায়।

সাধারণত ব্র্যান্ড চরিত্রকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। এটি বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান ও প্যাকেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে মূখ্য নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। ব্র্যান্ড চরিত্রগুলোর কিছু আছে অ্যানিমেটেড চরিত্র যেমন- মীনা, রাজু এবং মিঠু (মীনা কার্টুনে), হালুম, টুকটুকি, ইকরি, এবং শিকু (১২৩ সিসিমপুরে), আর কিছু আছে বাস্তবিক চরিত্র যেমন- জুয়ান ভালদেজ (কলম্বিয়ান কফি) এবং রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের মতো লাইভ-অ্যাকশন ফিগার।

কোম্পানিকে তার ব্র্যান্ডের জন্য এমন চরিত্র তৈরি করতে হয় যা সমস্ত চ্যানেল জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কোম্পানির জন্য অনন্য পরিচয় বহন করে। তবে ব্র্যান্ড চরিত্র পছন্দ করার ক্ষেত্রে জেনেরিক বা জাতিগত চরিত্র এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা গ্রাহকরা এগুলো ভুলে যেতে পারেন। পাশাপাশি, ব্র্যান্ড চরিত্র যেন খুব বেশি নম্র বা মসৃণ না হয়, সেটিও খেয়াল রাখতে হবে। কেননা একটি মসৃণ বা শান্ত ব্র্যান্ড চরিত্র ব্র্যান্ডটিকে প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা হতে সাহায্য নাও করতে পারে।

## ব্র্যান্ড চরিত্রের গুরুত্ব

## Importance of Brand Characters

ব্র্যান্ড চরিত্র ডিজাইন করার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চরিত্র বাছাই করতে হয়। কেননা সঠিক ব্র্যান্ড চরিত্র তৈরি করতে না পারলে কোম্পানির অনন্য অবস্থান অর্জন সম্ভব হবে না। ব্র্যান্ড চরিত্র বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হয় যেন গ্রাহকরা তার সাথে যোগাযোগ করতে চান, বিশ্বস্ত হতে হয় যেন গ্রাহকরা সঠিক তথ্যের জন্য তার উপর নির্ভর করতে পারেন, দক্ষ হতে হয় যেন গ্রাহকরা তার কাছে পরামর্শ এবং নির্দেশনার জন্য যেতে পারেন, এবং উদ্দীপনা প্রদানে সক্ষম হতে হয় যেন গ্রাহকদের তার পণ্য বা সেবা সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। নিম্নে ব্র্যান্ড চরিত্রের উপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১। **দৃষ্টি আকর্ষণকারী (Attention Getting):** ব্র্যান্ড চরিত্র তার বর্ণিল ও সমৃদ্ধ চিত্রাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করতে পারে।

২। **ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টি (Creating Brand Awareness):** কোম্পানিগুলো ব্র্যান্ড গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য ব্র্যান্ড চরিত্রের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ভাবে ফুটিয়ে তুলে ব্র্যান্ড সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

৩। **বাজারে অবস্থান সৃষ্টি (Create Market Position):** ব্র্যান্ড চরিত্রগুলো ব্র্যান্ডকে বাজারের বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং বাজারে কোম্পানির ব্র্যান্ডের ভালো অবস্থান তৈরি করে।

৪। **পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি (Enhance Likeability):** ব্র্যান্ড চরিত্রের মানবিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো পণ্যের ব্র্যান্ড পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

৫। **ব্র্যান্ড উপলব্ধি সৃষ্টি (Create Brand Perception):** ব্র্যান্ড চরিত্রের মানবিক সাদৃশ্য ব্র্যান্ডকে মজার ও আর্কষণীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রাহক উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৬। **ব্র্যান্ড সম্পর্ক গঠন (Form Brand Relationship):** ব্র্যান্ড চরিত্রে মাধ্যমে সহজেই একটি ব্র্যান্ড একজন গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী ব্র্যান্ড সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। কেননা ব্র্যান্ড চরিত্র মানুষের মতো বুড়িয়ে যায় না, বা একে ব্যবস্থাপনায় বাড়তি অর্থও লাগে না।

৭। **সহজ স্থানান্তর (Easy Transferability):** বৈশিষ্ট্যগতভাবে ব্র্যান্ড চরিত্রে যেহেতু সরাসরি কোনো পণ্যের তাৎপর্য থাকে না, তাই ব্র্যান্ড চরিত্রকে তুলনামূলক ভাবে সহজে পণ্য বিভাগের মধ্যে স্থানান্তর করা যায়।

ব্র্যান্ড চরিত্র ব্র্যান্ডের সাথে তার শ্রোতা, জ্ঞাতিত্ব, ব্র্যান্ডের মান, স্মরণশক্তি এবং ব্র্যান্ড স্বীকৃতির সহজতার নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় ব্র্যান্ডের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক মান নির্ধারণ করে, এটি গ্রাহকের আস্থা তৈরি করে এবং আনুগত্য আকর্ষণ করে।

## স্লোগান বলতে কী বুঝায়?

## What is meant by Slogans?

স্লোগান হলো মনোযোগ আকর্ষণকারী সংক্ষিপ্ত একটি বিবতি যা একটি ব্র্যান্ডের পণ্য ও সেবা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্লোগানের এই ছোট বাক্যগুলো কোম্পানির মূল কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক লক্ষ্যকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে। কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ডের সাথে কী সংযুক্ত করতে চান বা তাদের ব্র্যান্ড মূলত কোন কাজটি করে, সেটি তাদের গ্রাহকদের জানাতে স্লোগান ব্যবহার করে থাকে। একটি আকর্ষণীয় স্লোগান সাধারণত গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্ররোচক এবং বর্ণনামূলক উপাদানের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে।

এই প্রসঙ্গে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Slogans are short phrases that communicate descriptive or persuasive information about the brand. They often appear in advertising but can play an important role on packaging and in other aspects of the marketing program." অর্থাৎ, স্লোগান হলো ছোট বাক্যাংশ যা ব্র্যান্ড সম্পর্কে বর্ণনামূলক বা প্ররোচনামূলক তথ্য প্রদান করে। স্লোগান সাধারণত বিজ্ঞাপনেই প্রদর্শিত হয় তবে প্যাকেজিং এবং বিপণন কার্যক্রমের অন্যান্য দিকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে **Dirksen & Kroeger** বলেন, "The slogan is a brief message crystalizing an important idea about the product or reason for buying the product which is expressed at greater length in the copy"। অর্থাৎ,

স্লোগান হলো একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা যা পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বা পণ্য কেনার কারণকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে এবং যাকে বিজ্ঞাপন কপিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, স্লোগান হল একটি স্মরণীয় বাক্যাংশ বা মূলমন্ত্র যা একটি ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য এবং প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তিমূলক প্রকাশ নিশ্চিত করে। ব্র্যান্ডের স্লোগান সম্ভাব্য গ্রাহকদের সেই পণ্য বা সেবা কেনার জন্য পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির প্রস্তাবিত জিনিসগুলোকে শ্রুতিমধুর এবং মজাদার উপায়ে বর্ণনা করে।

স্লোগানগুলোকে প্রায়শই ব্র্যান্ড নামের নিচে স্থাপন করা হয়। পণ্য ক্রয়ের সময় খেয়াল করলে দেখা যায়, পণ্য প্যাকেজিংয়ে ব্র্যান্ড নামের নিচে একটি লাইন বিশেষভাবে লেখা থাকে বা বিজ্ঞাপনগুলোতে একটি লাইনকে বিশেষভাবে বলা হয়। এগুলোই স্লোগান। যেমন- ম্যাকডোনাল্ডসের বিজ্ঞাপনের শেষে বলা থাকে “I’m lovin’ It”।

## স্লোগানের সুবিধাসমূহ
## Benefits of Slogans

স্লোগান হলো একটি ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত হওয়া একটি বাক্যাংশ, যার প্রধান লক্ষ্য হল সেই ব্র্যান্ডকে প্রচার করা এবং মানুষকে এটি কেনাকাটা করতে বা ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ করা। শ্লোগান ব্র্যান্ডিংয়ের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। এটি ব্র্যান্ড নামের মতোই ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ব্র্যান্ডের মূল প্রস্তাবনাকে অর্থবহ করে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য শ্লোগান একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নিম্নে স্লোগানের সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

১। **দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ (Fast Attention Getting):** ভালো স্লোগান অত্যন্ত দ্রুততার সাথে, এমনকি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহায়ক একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

২। **বিপণন প্রচারাভিযানে গতি আনয়ন (Fostering Advertising Campaign):** একটি ভালো স্লোগান তৈরি করে কোম্পানিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিপণন প্রচারাভিযানগুলোতে বাড়তি গতি আনতে পারে।

৩। **স্মরণীয়তা বৃদ্ধি (Easy Memorability):** একটি সৃজনশীল স্লোগান মানুষের মনে দীর্ঘ সময়ের জন্য কোম্পানির ব্র্যান্ড বা পণ্য ও সেবাগুলোকে স্মরণ রাখতে সহায়তা করে।

৪। **ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টি (Creating Brand Awareness):** ব্র্যান্ড নামকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু স্লোগান ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যেমন- NCC ব্যাংকের স্লোগান হচ্ছে, “With you. Always”। অর্থাৎ, গ্রাহকের সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং চাহিদা পূরনে এনসিসি ব্যাংক কাজ করছে।

৫। **বাজার অবস্থানকে শক্তিশালী করা (Strengthening Market Position):** একটি আকর্ষণীয় ব্র্যান্ড স্লোগান ব্র্যান্ডের বাজার অবস্থান গ্রহণকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

৬। **বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানে সহায়তা (Helps in Advertising Campaign):** স্লোগান অনেক সময় বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের বর্ণনামূলক ও প্ররোচনামূলক তথ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনার জন্য ট্যাগ লাইন হিসাবে কাজ করে।

৭। **ব্র্যান্ড পরিচয় গঠন (Creating Brand Identity):** স্লোগানগুলো ব্র্যান্ড পরিচয় গঠন করতে এবং একে মজবুত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। **ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠা (Establishing Brand Promise):** ব্র্যান্ডের মূল প্রতিশ্রুতিকে সংক্ষিপ্ত ও স্মরণীয় অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে, স্লোগানগুলো ব্র্যান্ডের মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ভালো স্লোগান ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি ও স্মরণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে ব্র্যান্ডের একটি শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সংযোগ গড়ে তোলে। ভালভাবে নির্মিত একটি স্লোগান ব্র্যান্ডের মূল্যবোধের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে কাজ করে, যা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্র্যান্ডটিকে সহজেই শনাক্ত করতে ও স্বতন্ত্র করে তুলতে সহায়ক হয়।

## ঝংকার বলতে কি বুঝায়?

## What is meant by Jingles?

জিঙ্গেল বা ঝংকার হলো একটি ছোট সুর বা গান যা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ঝংকারের শ্রতিমধুর সুর ও ছন্দ দ্রুত গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং ব্র্যান্ডটিকে তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে সক্ষম করে ও একটি স্থায়ী ব্র্যান্ড প্রভাব তৈরি করে।

স্মরণীয় ঝংকার তৈরি করতে তাই সঙ্গীত উপাদানগুলোকে প্রাধান্য দিতে হয়। ঝংকারের সুর এবং শব্দগুলো আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য এবং শ্রুতিমধুর হতে হয়। এছাড়াও, ঝংকারটিকে ব্র্যান্ডের সাথে ইতিবাচকভাবে সংযুক্ত হতে হয় যেন এটি ব্র্যান্ডের চিত্র এবং জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

ঝংকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Jingles are musical messages written around the brand." অর্থাৎ, ঝংকার হলো ব্র্যান্ডকে কেন্দ্র করে লেখা সঙ্গীতপূর্ণ বার্তা।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্র্যান্ড পরামর্শক **Paul Mills** বলেন, "Jingles are short, catchy musical tunes used in advertising to promote products or brands. They create emotional connections, enhance brand recall, and differentiate brands, but overuse, cultural differences, and changing preferences can pose challenges. Marketers should always think beyond the tune." অর্থাৎ, ঝংকারগুলো হলো পণ্য বা ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় সঙ্গীত সুর। এগুলো আবেগীয় সংযোগ তৈরি করে, ব্র্যান্ড মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং ব্র্যান্ডকে পৃথক করে তোলে। তবে অত্যধিক ব্যবহার, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং পরিবর্তনশীল গ্রাহক পছন্দ ঝংকারের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তাই ঝংকার তৈরির সময় বিপণনকারীদের সবসময় সুরের বাইরেও চিন্তা করা উচিত।

ঝংকারের উদাহরণ হিসেবে ড্যানিশ কনডেন্সড মিল্কের বিজ্ঞাপনের কথা বলা যায়, যেখানে বলা হতো "তুমি, আমি আর ড্যানিশ", যা এখনো আমাদের কানে বাজে। স্মরণীয় ব্র্যান্ড ঝংকারগুলো সহজে ভুলে যাওয়া যায় না। ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রচারে ঝংকার একটি শক্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

## ঝংকারের সুফল

## Benefits of Jingles

ঝংকার হলো একটি সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় সঙ্গীত সুর বা অডিও স্লোগান যা পণ্য, ব্র্যান্ড বা সেবার প্রচারের জন্য একটি কার্যকর বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঝংকার গুলোকে সাধারণত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, রেডিও বা টিভি বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিপণন প্রচারাভিযানে ব্র্যান্ড স্বীকৃতি তৈরি করতে, ব্র্যান্ড বার্তা জোরদার করতে এবং ব্র্যান্ড মনে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। ব্র্যান্ড উপাদান হিসেবে ঝংকারের সুফলগুলো হলোঃ

**১। ব্র্যান্ড নামের সমার্থক (Synonymous to Brand Name):** ব্র্যান্ড নামের পাশাপাশি ঝংকারও একটি প্রধান ব্র্যান্ড উপাদান হয়ে উঠতে পারে। কিছু কিছু ঝংকার এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে যে, সেসব ব্র্যান্ড তাদের ঝংকারের সাথে সমার্থক হয়ে উঠেছে। যেমন-"চলো সবাই, জীবনের আহ্বানে, সামনে এগিয়ে যাই" টিভিতে বাজতে শুরু করলেই দর্শক-শ্রোতারা নেসক্যাফের কথা ভাবেন।

**২। মানুষের কথা দ্বারা বিপণন (Word of Mouth Marketing):** ঝংকারগুলো অনেকটা ভালো গানের মতো। কোন গ্রাহক একবার এটি শুনলে এবং এটি তার ভালো লেগে গেলে, সে তার বন্ধুদের এবং পরিবারকে এর সম্পর্কে জানাতে পারে। ফলে, ঝংকার আসলে মানুষের কথা দ্বারা বিপণন বা "ওয়ার্ড অফ মাউথ" বিপণন করে।

**৩। সহজে মনে রাখা (Easy Memorability):** ঝংকারগুলো সাধারণত খুব প্রাণবন্ত, হাসির এবং আনন্দময় হয়ে থাকে। এগুলো মজার এবং সহজে শোনা যায় বলে এসব গান, কবিতা, ছন্দ এবং স্বর প্যাটার্ন সহজে মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। ফলে ঝংকার মনে রাখা সহজ হয়।

**৪। ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি (Increasing Brand Awareness):** ঝংকারের মধ্যে কোম্পানির ব্র্যান্ডের নাম বারবার উচ্চারিত হয় বলে, এগুলো ব্র্যান্ড মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে চূড়ান্তভাবে ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তাই যখন গ্রাহকরা কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করার জন্য প্রস্তুত হয়, তাদের মনে হয় যে কোম্পানির ব্র্যান্ডই সবচেয়ে সেরা।

**৫। সহজে মনোযোগ আকর্ষণ (Easy Attention Grabbing):** ঝংকার সহজে গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেটের বদৌলতে তথ্যের আধিক্য খুবই সাধারণ একটা বিষয়। বিপণনকারীদের তাই সম্ভাব্য গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ঝংকারগুলো গ্রাহক মনোযোগ আকর্ষণের এই লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়ক সবচেয়ে কার্যকর বিপণন সরঞ্জামগুলোর মধ্যে একটি।

**৬। বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার (Use of Multiple Media):** ঝংকার বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৬৩.১ ভাগ মানুষ টেলিভিশনে ঝংকার দেখেন। স্ট্রীমিং প্লাটফর্ম যেমন- YouTube এবং Hulu দ্বিতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ঝংকারের মাধ্যম এবং রেডিও ঝংকারের তৃতীয় জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

**৭। অনন্য ব্র্যান্ড পরিচিতি (Unique Brand Identity):** ঝংকার কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্বকে আকর্ষনীয়, সম্পর্কিত এবং প্রিয় হিসেবে গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপনে সাহায্য করে। এগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোম্পানিকে তার প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করার জন্য একটি অনন্য উপায় হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, ঝংকার কোম্পানিকে বা কোম্পানির ব্র্যান্ডকে প্রতিযোগীদের মধ্যে আলাদা হতে সাহায্য করতে পারে।

**৮। বিজ্ঞাপনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে (Foundation of Advertising):** ঝংকার বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞাপনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন- ইন্টেল কোম্পানির সিগনেচার স্লোগান "In-tel In-side." বছরের পর বছর ধরে কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মৌলিক ট্যাগলাইন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ঝংকারগুলো শ্রুতিমধুর, আকর্ষক এবং স্মরণীয়। এগুলো কোম্পানি ও ব্র্যান্ডের বিভিন্ন বিপণন লক্ষ্য অর্জন করতে যেমন- সচেতনতা তৈরি করা, ব্র্যান্ড স্বীকৃতি ও মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সারসংক্ষেপ:**

ব্র্যান্ড চরিত্র হলো একটি বিশেষ ধরনের ব্র্যান্ড প্রতীক যা মানুষের বা বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় এমন কোন বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে এবং একটি ব্যক্তিত্ব তৈরি করে যা ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে। ব্র্যান্ড চরিত্র ব্র্যান্ডের প্রতি সহজেই গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আর্কষণীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রাহক উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়তা করে, গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী ব্র্যান্ড সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং ব্র্যান্ড চরিত্রকে তুলনামূলকভাবে সহজে পণ্য বিভাগের মধ্যে স্থানান্তর করা যায়। স্লোগান হলো একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা যা পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বা পণ্য কেনার কারণকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে এবং যাকে বিজ্ঞাপন কপিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এটি ব্র্যান্ডিংয়ের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিশালী একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ভালো স্লোগান অত্যন্ত দ্রুত গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, ব্র্যান্ডের বাজার অবস্থান গ্রহণকে শক্তিশালী করে, বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের বর্ণনামূলক ও প্ররোচনামূলক তথ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনার জন্য ট্যাগ লাইন হিসেবে কাজ করে, ব্র্যান্ড পরিচয় গঠন করতে সাহায্য করে এবং ব্র্যান্ডের মূল প্রতিশ্রুতিকে সংক্ষিপ্ত ও স্মরণীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। ঝংকারগুলো হলো পণ্য বা ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় সঙ্গীতপূর্ণ বার্তা। ঝংকার গুলোকে সাধারণত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, রেডিও বা টিভি বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিপণন প্রচারাভিযানে ব্র্যান্ড স্বীকৃতি তৈরি করতে, ব্র্যান্ড বার্তা জোরদার করতে, ব্র্যান্ড মনে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে, মানুষের কথা দ্বারা বিপণন বা "ওয়ার্ড অফ মাউথ" বিপণনের সুযোগ তৈরিতে এবং অনন্য ব্র্যান্ড পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে থাকে।

# পাঠ-৬.৫ মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং
# Packaging

**উদ্দেশ্য**

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্যাকেজিং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্যাকেজিং পরিবর্তনের কারণসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পণ্য উৎপাদনের পর থেকে শুরু করে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্নভাবে হাতবদলের সময় পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, গুনগতমান সংরক্ষণ করা, আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে পণ্যকে রক্ষা করা, পণ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রদান করা, এবং গ্রাহকদের কাছে পণ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর মোড়কের নকশা করা, তৈরি করা এবং পণ্যকে মুড়িয়ে ফেলার সামগ্রিক কার্যক্রমকে প্যাকেজিং বলে। একটি ভালো প্যাকেজিং ব্র্যান্ডের পরিচয় সনাক্ত করতে, প্রতিযোগী অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে পণ্যটিকে পৃথক করতে, পণ্যটি পরিবহন ও বিতরণকে ঝামেলামুক্ত করতে, পণ্য সংশ্লিষ্ট বর্ণনামূলক এবং প্ররোচনামূলক তথ্য গ্রাহকদের জানাতে, এবং পণ্যটি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এছাড়া, পণ্যকে বিভিন্ন রকম ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে, পণ্যের স্থানান্তরকে সহজ করতে, পণ্যের গুনগতমান সংরক্ষণ করতে, ক্রেতা আকর্ষণ করতে, পণ্য বা ব্র্যান্ডের প্রসারে, নতুন বাজার অংশ দখল করতে এবং অনন্য ব্র্যান্ড স্বীকৃতি তৈরি করতে প্যাকেজিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। যদিওবা প্যাকেজিং পরিবর্তন বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার, কিন্তু নানা কারণেই আমাদের প্যাকেজিং পরিবর্তন করতে হয়। প্যাকেজিং পরিবর্তন করে সম্ভাব্য উচ্চ মূল্যের ইঙ্গিত দেওয়া যায়, কার্যকরভাবে পণ্য বিক্রয় করা যায় এবং পণ্য সারি বর্ধিতকরণ করা যায়।

## মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং বলতে কী বুঝায়?
## What is meant by Packaging?

হাঁস-মুরগীর খামার থেকে ডিমকে যদি ডিমের ট্রেতে বাক্সবন্দী করা না হয়, তবে সে ডিম খুচরা বিক্রেতার কাছে পরিবহন করা সম্ভব নয় এবং চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর আগেই এগুলো ভেঙে যেতে পারে।একটি সাদা শার্ট যদি প্যাকেজিং বা মোড়ক ছাড়া পরিবহন ও বিক্রি করা হয় তবে এতে দাগ পড়তে পারে। একইভাবে, টেট্রা প্যাক না থাকলে তরল দুধ একদিন পরেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। প্যাকেজ বা মোড়ক হচ্ছে একটি আবরণ যা দিয়ে পণ্যকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ঢেকে বা মুড়ে দেয়া হয়। এই মোড়কের নকশা করা, তৈরি করা এবং পণ্যের গায়ে লাগিয়ে দেওয়ার কাজকেই প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ বলে।

পণ্য পরিবহনের সময় তা ভেঙে যেতে পারে, নাড়াচাড়া করার কারণে পণ্যের ক্ষতি হতে পারে কিংবা দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের ফলে পণ্যের রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই পণ্য উৎপাদনের পর পরিবহন থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে হাতবদলের সময় পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, গুনগতমান সংরক্ষণ করা, আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে পণ্যকে রক্ষা করা, পণ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রদান করা, এবং গ্রাহকদের কাছে পণ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর মোড়কের নকশা করা, তৈরি করা এবং পণ্যকে মুড়িয়ে ফেলার সামগ্রিক কার্যক্রমকে প্যাকেজিং বলে।

এ প্রসঙ্গে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Packaging is the activities of designing and producing containers or wrappers for a product." অর্থাৎ, একটি পণ্যের জন্য মোড়ক নকশা করা ও তা তৈরি করার কার্যক্রমকে প্যাকেজিং বলা হয়।

**Philip Kotler & Gary Armstrong** এর মতে, "Packaging is the activities of designing and producing the container or wrapper for a product." অর্থাৎ, প্যাকেজিং হলো একটি পণ্যের জন্য ধারক বা মোড়ক নকশা করা ও উৎপাদনের সাথে সংশিষ্ট কার্যক্রম।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পণ্যের ধারক, আবরণ বা মোড়ক তৈরি করে পণ্যকে নিরাপদ করা, ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, গুনগত মান নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষন করা, গ্রাহকদের জরুরী তথ্য প্রদান করা এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্যাকেজের নকশা প্রণয়ন, উৎপাদন এবং উন্নয়ন করার প্রক্রিয়াকে প্যাকেজিং বলা হয়।

## প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্য

## Objectives of Packaging

অন্যান্য ব্র্যান্ড উপাদান গুলোর মতো প্যাকেজিং-এরও সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। আদিকাল থেকেই মানুষ খাদ্য ও পানীয় পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য গাছের পাতা ও পশুর চামড়া ব্যবহার করতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে মোড়ক হিসেবে কাঁচের তৈরি পাত্রের ব্যবহার সর্ব প্রথম লক্ষ্য করা যায় মিশরে। পরবর্তীতে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান খাদ্য সংরক্ষণের উন্নত উপায় উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বায়ুশূণ্য প্যাকিং পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ১২,০০০ (বারো হাজার) ফ্রাঙ্ক পুরষ্কার দেন। এ থেকেই ধারনা পাওয়া যায়, প্যাকেজিং মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন উপায়ে অবদান রেখে চলেছে।

প্যাকেজিং বলতে একটি পণ্যের চারপাশের আবরণ বা মোড়ানোর উপকরণের নকশা করা, উপকরণটি তৈরি করা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করাকে বুঝায়। কোম্পানি ও গ্রাহক উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে প্যাকেজিং এর বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ✓ ব্র্যান্ডের পরিচয় সনাক্ত করা,
- ✓ বাজারের অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে পণ্যটি পার্থক্য করা,
- ✓ পণ্যটি পরিবহন ও বিতরণ করা,
- ✓ বর্ণনামূলক এবং প্ররোচনামূলক তথ্য প্রদর্শন করা,
- ✓ পণ্যটি সংরক্ষণ করা,
- ✓ পণ্যটি প্রচার করা,
- ✓ পণ্যটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা,
- ✓ বাড়ড়তে সংরক্ষণে সহায়তা করা,
- ✓ পণ্য খোলা ও পুণঃসিল করতে সহায়তা করে,
- ✓ প্রথম ব্যবহারের পর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা,
- ✓ পচনশীল পণ্যের ন্যূনতম স্থায়িত বজায় রাখা ইত্যাদি।

বিপণনকারীদেরকে অবশ্যই গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণ এবং বিপণন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্যাকেজিং-এর নান্দনিক ও ব্যবহারিক উপাদান নির্বাচন করতে হয়। নান্দনিক উপাদানটি প্যাকেজের আকার-আকৃতি, গান, বিষয়, রং, শব্দ এবং গ্রাফিক্সের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হয়। উন্নত প্রিন্টিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন দৃষ্টিনন্দন ও আকষর্ণীয় প্যাকেজ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ব্যবহারিক কাঠামোগত নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে প্যাকেজগুলো খোলা ও পুনঃসিলযোগ্য এবং নকল প্রতিরোধক করে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

## প্যাকেজিং এর গুরুত্ব

### Importance of Packaging

প্যাকেজিং একটি পণ্য তৈরি থেকে শুরু করে এটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক বিপণনকারী প্যাকেজিংকে বিপণন মিশ্রণের পঞ্চম **"P"** হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। পণ্যকে বিভিন্ন রকম ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, পণ্যের স্থানান্তরকে সহজ করা, পণ্যের গুনগতমান সংরক্ষণ করা, ক্রেতা আকর্ষণ করা, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা এবং পণ্য প্রসারে প্যাকেজিং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে প্যাকেজিংয়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো:

১। **পণ্য ধারণ করা (Contains the Product):** অধিকাংশ পণ্যই পরিবহন, সংরক্ষণ বা ব্যবহারকালে ধারণ করার প্রয়োজন হয়। প্যাকেজিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথভাবে ধারণ করা হয়েছে।

২। **পণ্য রক্ষা করা (Protects the Product):** প্যাকেজিং পণ্য এবং এর গুণমান, বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা ইত্যাদিকে পরিবহন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারকালে ক্ষয়ক্ষতি বা দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

৩। **পণ্য হ্যান্ডেলিং এবং ব্যবহার সহজ করে (Aids Product Handling and Usage):** সঠিক প্যাকেজিং পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে সহায়তা করে। এটি পণ্য পরিবহন, প্রেরণ এবং এমনকি ব্যবহার করার উপায় গুলোকে সহজ করে তোলে।

৪। **পণ্যটিকে পৃথক করে তোলে (Differentiates the Product):** প্যাকেজিং গ্রাহকের জন্য পণ্যটি শনাক্ত ও অন্যান্য পণ্য থেকে পার্থক্য করার কাজটিকে সহজ করে তোলে। এছাড়াও আকর্ষণীয় প্যাকেজগুলো আলাদা হওয়ার এবং অনন্যতার মাধ্যমে গ্রাহকদের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

৫। **পণ্য বিপণন কৌশলের অংশ গঠন করে (Forms a Part of Product Marketing Strategy):** একটি আকর্ষণীয় এবং তথ্যবহুল প্যাকেজ পণ্যটিকে আলাদা করে এবং প্রচারমূলক আকর্ষণ তৈরি করে। এছাড়াও প্যাকেজিং পণ্য প্রচার এবং বিক্রয়ের চূড়ান্ত স্পর্শবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। গ্রাহকেরা অনেক সময় প্যাকেজিংকেই বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখে থাকেন।

৬। **গ্রাহকের সুবিধা প্রদান করে (Provides Customer Convenience):** প্যাকেজিং গ্রাহকের জন্য পণ্যটি বহন, পরিবহন এবং ব্যবহার করা সুবিধাজনক করে তোলে। ফলে গ্রাহক কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি সুবিধাজনক আকার বা পরিমাণে নিয়ে সুবিধাজনক স্থানে ব্যবহার করতে পারেন।

৭। **যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে (Acts as a Communication Medium):** লেবেলিং সহ প্যাকেজিং ব্র্যান্ড পরিচয়, ব্র্যান্ড বার্তা এবং পণ্য ও কোম্পানির তথ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

৮। **নান্দনিক মান যোগ করে (Adds to the Aesthetic Value):** প্যাকেজিং একটি সাধারণ পণ্যকে আকর্ষণীয় বা একটি অনন্য পণ্যকে সাধারণ দেখাতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক স্পর্শবিন্দু যা একটি বিক্রয় প্রচেষ্টাকে সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে।

৯। **আকর্ষণ বৃদ্ধি (Increased Attention):** বর্তমানে চিত্তাকর্ষক রং, ছবি, নক্সা ও আকর্ষণীয় কাগজ দ্বারা প্যাকেজিং করা হয়। এগুলো তাই সহজে ব্র্যান্ডের দিকে গ্রাহকদের আকর্ষণ বাড়ায়, গ্রাহকদের মনোযোগ ব্র্যান্ডের প্যাকেজিংয়ে আটকে ফেলে এবং ব্র্যান্ডটি ক্রয়ে গ্রাহকরা উদ্বুদ্ধ হয়।

১০। **ব্র্যান্ড স্বীকৃতি (Brand Recognition):** পণ্য বা ব্র্যান্ডের প্যাকেজিং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় বলে বারবার ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকরা ব্র্যান্ড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন। ফলে প্যাকেজিং ব্র্যান্ড স্বীকৃতি তৈরির গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হতে পারে।

১১। **ব্র্যান্ড এ্যাসোসিয়েশন তৈরি (Brand Association):** পণ্যের প্যাকেজে পণ্যের উপাদান, মূল্য, ব্যবহারবিধি, উপকারিতা, সতর্কতা, উৎপাদনের স্থান, উৎপাদনের সময়, মেয়াদ ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। এসব তথ্যের যথাযথ উপস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যটি তার ব্র্যান্ড অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে।

১২। **বিক্রয় বৃদ্ধি (Increased Sales):** অনেক সময় একই প্যাকেজের পণ্যে গ্রাহকদের একঘেয়েমি চলে আসে। তখন প্যাকেজের নকশা বা রং পরিবর্তন করে সেই পণ্যে পুনরায় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা যায় এবং তাৎক্ষণিক বিক্রয় বৃদ্ধি করতে পারে। যেমন- "Häagen-Dazs" প্যাকেজ পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের বিক্রির পরিমাণ ২১% বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। লাক্স সাবান, হরলিক্স, ভিম এর মত ব্র্যান্ড গুলো এ কারণেই সময় সময় প্যাকেজিংয়ে পরিবর্তন আনে।

১৩। **নতুন বাজার অংশ দখল (Capturing New Market Segments):** প্যাকেজিংয়ে কিছুটা নতুনত্ব এনে, যেমন- ছোট, মাঝারি বা বড় সাইজের প্যাকেজিং করে অনেক সময় ব্র্যান্ডটির বাজার সম্প্রসারণ করা যায় এবং নতুন বাজার বিভাগে ব্র্যান্ডটিকে স্থাপন করে বাজার অংশ দখল করা যায়।

১৪। **পুনর্ব্যবহার (Reuse):** অনেক পণ্যের প্যাকেজিংয়ে এমন কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যেগুলো পুনর্ব্যবহার করা যায়। এরকম প্যাকেজিং পরিবেশের জন্য উপকারী।

ভাল প্যাকেজিং হলো যার কাজের উপযোগিতা আছে, যা এর পণ্যকে রক্ষা করে, সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং যাকে উৎপাদনের সময় জ্বালানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি ও এমন কাঁচামাল ব্যবহার করে যা এর কার্বন পদচিহ্ন কমায়। তাই উত্তম প্যাকেজিং তৈরি করতে আমাদের অবশ্যই সর্বোত্তম নকশা, ব্যবহারকারীর সুবিধা এবং কার্যকর উপকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং নিশ্চিত করতে হবে।

## প্যাকেজিং পরিবর্তন

## Changes in Packaging

আমরা জানি, প্যাকেজিং পরিবর্তন বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার। কিন্তু নানা কারণেই আমাদের প্যাকেজিং পরিবর্তন করতে হয়। তবে ব্যয় বহুল হলেও ঠিকভাবে করতে পারলে অন্যান্য বিপণন ব্যয়ের তুলনায় এটি ব্যয়সাশ্রয়ী হতে পারে। নিম্নে প্যাকেজিং পরিবর্তনের কারণগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

১। **উচ্চ মূল্যের ইঙ্গিত (To signal a higher price):** কোম্পানিগুলো অনেক সময় তাদের বিদ্যমান পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে থাকে। তখন প্যাকেজ আধুনিকায়নের মাধ্যমে তারা সম্ভাব্য উচ্চ মূল্যের ইঙ্গিত দেয়।

২। **কার্যকরভাবে পণ্য বিক্রয় (Effective Product Selling):** কোম্পানিগুলো সাধারণত স্বল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে চায়। প্যাকেজিং পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন বাজার বিভাগে প্রবেশ করে এটা সহজেই করা যায়।

৩। **পণ্য সারি বর্ধিতকরণ (Product Line Expansion):** কোনো কোম্পানি তার পণ্য সারি বর্ধির্ত করার প্রয়োজন মনে করলে প্যাকেজিং পরিবর্তন করতে পারে। প্যাকেজিংয়ে কিছুটা নতুনত্ব এনে, যেমন- ছোট, মাঝারি বা বড় সাইজের প্যাকেজিং বাজারে উপস্থাপন করে অনেক সময় একটি বাজার সম্প্রসারণ করা যায়, পণ্য সারি বর্ধিত করা যায় এবং নতুন বাজার বিভাগে প্রবেশ করা যায়।

৪। **নতুন পণ্য উদ্ভাবন (New Product Innovation):** কোন কোম্পানি নতুন কোন পণ্য উদ্ভাবন করলে, বিদ্যমান প্যাকেজের বাইরে প্যাকেজ পরিবর্তনের বা পুনঃডিজাইনের সংবাদ গ্রাহকদেরকে সাধারণত বিজ্ঞাপন বা মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে থাকেন।

৫। **পুরাতন প্যাকেজিং সেকেলে দেখালে (The Old Package Just Looks Outdated):** প্যাকেজ নকশায় পরিবর্তন আনার একটি মৌলিক কারণ হলো পুরাতন প্যাকেজিং সেকেলে দেখায় বা গ্রাহকদের কাছে একঘেয়ে লাগে। তখন গ্রাহকদের চোখে নতুনত্ব আনতে প্যাকেজিং পরিবর্তন একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় খুব দ্রুতগতিতে প্যাকেজিং-এর পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বিপণনকারীদেরকে প্যাকেজ পরিবর্তনের সুফল অনুধাবন করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং পরিবর্তন করতে হবে।

**সারসংক্ষেপ:**

প্যাকেজিং বলতে একটি পণ্যের চারপাশের আবরণ বা মোড়ানোর উপকরণের নকশা করা, উপকরণটি তৈরি করা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করাকে বুঝায়। পণ্যের ধারক, আবরণ বা মোড়ক তৈরি করে পণ্যকে নিরাপদ করা, ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, গুনগত মান নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষন করা, গ্রাহকদের জরুরী তথ্য প্রদান করা, এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করাই প্যাকেজিং এর মূল উদ্দেশ্য। পণ্যকে বিভিন্ন রকম ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, পণ্যের স্থানান্তরকে সহজ করা, পণ্যের গুনগতমান সংরক্ষণ করা, ক্রেতা আকর্ষণ করা, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা, পণ্য প্রসারে ভূমিকা রাখা, ব্র্যান্ড স্বীকৃতি তৈরি করা, গ্রাহকদের একঘেয়েমি দূর করে নির্দিষ্ট পণ্যে পুনরায় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা, তাৎক্ষণিক বিক্রয় বৃদ্ধি করা এবং প্যাকেজিং উপকরণগুলোর পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে আকর্ষণীয় প্যাকেজিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোম্পানিগুলো উচ্চ মূল্যের ইঙ্গিত দিতে, বাজার সম্প্রসারণ করতে, পণ্য সারি বর্ধিত করতে, নতুন বাজার বিভাগে প্রবেশ করতে, নতুন পণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করতে এবং পুরাতন প্যাকেজিং সেকেলে দেখালে প্যাকেজিং পরিবর্তন করে নতুন প্যকাজিং চালু করতে পারে।

# পাঠ-৬.৬ পণ্য কৌশল
# Product Strategy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিপণনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পণ্য কৌশল সমপর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানিগুলোর বাহ্যিক বিপণন পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বিপণনকারীগণ বিপণন কার্যক্রমের রীতিনীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গ্রাহকের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার ভাঙন, ইন্টারেক্টিভ এবং মোবাইল বিপণনের মতো বিকল্প মাধ্যম গুলোর বৃদ্ধি এবং চ্যানেল রূপান্তর এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দেওয়ার মতো পরিবর্তনের ফলে সমন্বিতভাবে ভোক্তা ও কোম্পানিগুলো নতুন ধরণের সক্ষমতা লাভ করেছে। এইসব সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য কৌশল নির্ধারণে অধিক যত্নবান হয়েছে। কোম্পানিগুলো শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরির জন্য ভোক্তার উপলব্ধ গুনগত মান অর্জনের লক্ষ্যে এমন পণ্য কৌশল প্রণয়ন করে যা পণ্য বা সেবাকে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের তুলনায় সার্বিক বিবেচনায় এগিয়ে রাখে। এছাড়াও বিক্রয়ের পর ক্রেতাদের পণ্য বা সেবা ভোগের অভিজ্ঞতা যাতে সুখকর ও স্মরণীয় হয়, সেটা নিয়ে কাজ করে থাকে। কোম্পানিগুলো তাদের বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ব্যবহার নির্দেশিকা, গ্রাহক সেবা কর্মসূচি এবং আনুগত্য কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

## বিপণনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি
## New Perspective on Marketing

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানিগুলো তাদের বিপণন কার্যক্রমের রীতিনীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন করেছে, কেননা কোম্পানিগুলোকে তাদের বাহ্যিক বিপণন পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও আইনগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তনগুলো বিপণনকারীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ✓ দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন,
- ✓ গ্রাহকের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি,
- ✓ ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার ভাঙন,
- ✓ ইন্টারেক্টিভ এবং মোবাইল বিপণনের মতো বিকল্প মাধ্যম গুলোর বৃদ্ধি,
- ✓ চ্যানেল রূপান্তর এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দেওয়া,
- ✓ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের মেলবন্ধন সৃষ্টি,
- ✓ বিশ্বায়ন এবং উন্নয়নশীল বাজারগুলোর দ্রুত প্রবৃদ্ধি,
- ✓ পরিবেশগত, সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং সামাজিক উদ্বেগ বৃদ্ধি,
- ✓ গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দা,
- ✓ বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি।

এই পরিবর্তন গুলো সমন্বিতভাবে ভোক্তা ও কোম্পানিকে নতুন ধরণের সক্ষমতা এনে দিয়েছে। নিম্নে এমন কিছু সক্ষমতা উল্লেখ করা হলো:

**ক) ভোক্তা (Consumers):**

১। ক্রেতারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

২। পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের উপলব্ধ পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে।

৩। প্রায় সবকিছুর সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পেতে পারে।

৪। অর্ডার বা ফরমায়েশ দেওয়া এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিপণনকারীদের সাথে আরও সহজে যোগাযোগ করতে পারে।
৫। অন্যান্য গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং পণ্য ও সেবা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরতে পারে।

**খ) কোম্পানি (Companies):**
১। কোম্পানি এবং পণ্য সম্পর্কে তথ্য প্রচার করতে এবং বিপুল ভৌগোলিক এলাকায় পৌঁছানোর জন্য একটি শক্তিশালী নতুন তথ্য এবং বিক্রয় চ্যানেল পরিচালনা করতে পারে।
২। কোম্পানির বাজার, গ্রাহক, সম্ভাব্য গ্রাহক এবং প্রতিযোগীদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং সমৃদ্ধ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
৩। প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহক এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের সাথে দ্বিমুখী যোগাযোগ সহজতর করতে এবং লেনদেনের দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
৪। যেসব গ্রাহক ও সম্ভাব্য গ্রাহক অনুমতি দেয় তাদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, কুপন, প্রচার এবং তথ্য পাঠাতে পারে।
৫। কোম্পানি প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ও সেবা অর্পণ করতে পারে।
৬। কোম্পানিগুলো তাদের ক্রয়, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

এ সকল নিত্যনূতন সক্ষমতার প্রভাবে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা চর্চার ক্ষেত্রে বিপণনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীর নতুন বিপণন পরিবেশ বিপণনকারীদেরকে তাদের প্রচলিত বিপণন কার্যক্রমে মৌলিকভাবে পরিবর্তন আনতে একপ্রকার বাধ্য করছে।

### পণ্য কৌশল

## Product Strategy

প্রতিটি সফল ব্র্যান্ডের পেছনে রয়েছে একটি সফল পণ্য। একটি ব্র্যান্ডকে ভোক্তারা কিভাবে গ্রহণ করবে তা নির্ধারিত হয় পণ্যের গুনাগুন দ্বারা। কাজেই ব্র্যান্ড বিপণনের পূর্বশর্ত হচ্ছে এমন ভাবে পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করা যা ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে। ব্র্যান্ড আনুগত্য তখনই তৈরি হয়, যখন পণ্যের গুনাগুন ভোক্তার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়ে যায় অথবা অন্তত আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে যায়। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে তাই যথাযথ পণ্য কৌশল নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পণ্য কৌশল নির্ধারণ একটি ব্র্যান্ডকে তার প্রতিযোগী ব্র্যান্ডগুলো থেকে এগিয়ে রেখে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

সঠিক পণ্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় দুইটির উপরে গুরুত্ব দিতে হয়ঃ

**(ক) উপলব্ধ গুণগত মান (Perceived Quality)**: একটি পণ্য বা সেবার সার্বিক গুণগত মান সম্পর্কে ভোক্তার মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তাই উপলব্ধ গুণগত মান বা Perceived Quality। এক্ষেত্রে ভোক্তা সাধারণত বাজারে প্রচলিত বিকল্প পণ্য বা সেবার সাথে তুলনা করে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবাকে গুণগত মান বিবেচনায় এগিয়ে রাখে। যেহেতু সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করে, যা একই সাথে ভোক্তাদের আরও ভালো পণ্য পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দেয়, কাজেই সন্তোষজনক উপলব্ধ গুণগত মান অর্জন করাটা বেশ কঠিন একটা কাজ। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় বেশ কিছু মানদন্ড উঠে এসেছে, যেগুলো উপলব্ধ গুণগত মান অর্জনে সহায়তা করে। যেমন- কোন একটি পণ্যের উপাদান, আনুষাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাসযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, সেবা প্রদানে সক্ষমতা, স্টাইল এবং ডিজাইন ভোক্তাদের কাছে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হলে ভোক্তারা সেই পণ্যকে গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য হিসেবে মনে করে। কাজেই শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরির পূর্বশর্ত হচ্ছে ভোক্তার উপলব্ধ গুনগত মান অর্জনের লক্ষ্যে এমন পণ্য কৌশল প্রণয়ন করা যা পণ্য বা সেবাকে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের তুলনায় সার্বিক বিবেচনায় এগিয়ে রাখে।

**(খ) বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা (Post-purchase Customer Management)**: ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরির একটা সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা। অনেক কোম্পানিই এই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার কারণে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। আধুনিক বিপণনের যুগে কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে যেমন শ্রম দেয়া হয়, তেমনি বিক্রয় পরবর্তী সময়ে ক্রেতাদের পণ্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, সন্তুষ্টি বা অভিযোগ ইত্যাদিকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। এই বিষয়টিকে বিপণনের ভাষায় বলা হয় After Marketing। এ পর্যায়ে বিক্রয়ের পর ক্রেতাদের পণ্য বা সেবা ভোগের অভিজ্ঞতা যাতে সুখকর ও স্মরণীয় হয়, যা পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ক্রেতাদের মনে দাগ কেটে থাকে, সেটা নিয়ে কাজ করা হয়।

বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা পণ্য কৌশলেরই একটি অংশ যা পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের পর ভোক্তাদের ভোগ অভিজ্ঞতাকে সহজ ও উপভোগ্য করে ব্র্যান্ড ইকুইটি তৈরিতে সহায়তা করে। কাজেই ব্র্যান্ড তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার আলাদা গুরুত্ব আছে। এবার দেখে নেয়া যাক কোম্পানিগুলো কিভাবে তাদের বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

### বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ

## Ways of Post-purchase Customer Management

বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়।

**(ক) ব্যবহার নির্দেশিকা (User Manuals)**: একজন ক্রেতার ভোগ অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয় পণ্য বা সেবার ব্যবহার নির্দেশিকা দ্বারা। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার নির্দেশিকা জরুরী। একটি ভোক্তা বান্ধব ব্যবহার নির্দেশিকার অভাবে ভোক্তার ভোগ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ে যেতে পারে। হয়তো পণ্য বা সেবার অনন্য কোন বৈশিষ্ট্য ছিলো, কিন্তু ব্যবহার নির্দেশিকা না থাকার কারণে ভোক্তা সেটা জানতেই পারলো না। এমনটি ঘটলে তা ব্র্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে পণ্য বা সেবার ব্যবহার নির্দেশিকা ডিজিটাল এবং সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া হওয়াটা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে ই-কমার্স সাইট daraz.com এর পণ্যের সাথে ভিডিও টিউটোরিয়াল একটি ভালো উদাহরণ। ভোক্তা বান্ধব ব্যবহার নির্দেশিকা বিক্রয় পরবর্তী ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে যা ব্র্যান্ড তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

**(খ) গ্রাহক সেবা কর্মসূচি (Customer Service Programs)**: বিক্রয় পরবর্তী গ্রাহক সেবা কর্মসূচি বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এর মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টি এবং আস্থা অর্জন সম্ভবপর হয়। গ্রাহক সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে খুব কাছ থেকে ক্রেতাদের পণ্য বা সেবা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় যা পরবর্তীতে অধিকতর ভালো পণ্য এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে। আবার বাজে গ্রাহক সেবা পণ্য বা সেবার ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবেও দেখা দিতে পারে। কার্যকরী গ্রাহক সেবা কর্মসূচিতে বিনিয়োগের বহুবিধ সুবিধা আছে। এর ফলে সন্তুষ্ট গ্রাহকের মাধ্যমে নতুন ক্রেতা জুটে যেতে পারে যা প্রকারান্তরে কোম্পানির প্রসার ব্যয় কমাতে ভূমিকা রাখে।

**(গ) আনুগত্য কর্মসূচি (Loyalty Programs)**: কোম্পানিসমূহ আনুগত্য কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের ক্রেতাদেরকে পুনঃক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে যা ব্র্যান্ড তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আনুগত্য কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রেতাদের অতিরিক্ত কিছু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অনুগত ক্রেতাতে পরিণত করা হয়। বলা হয়ে থাকে, নতুন ক্রেতা খোঁজার চাইতে পুরনো ক্রেতা ধরে রাখাটা বেশি লাভজনক। আনুগত্য কর্মসূচির মাধ্যমে বিক্রয় পরবর্তী সময়ে ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়। এতে করে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বাড়ে। সারা বিশ্বে এয়ার লাইন্স কোম্পানি গুলো তাদের আনুগত্য কর্মসূচির আওতায় একই গ্রাহককে পুনঃ ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বাড়াচ্ছে।

বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই উপায়সমূহ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব।

**সারসংক্ষেপঃ**

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানিগুলোর অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও আইনগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বিপণনকারীদের বিপণন কর্মসূচীর রীতিনীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন গ্রহণ করতে হয়েছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের মেলবন্ধন সৃষ্টি, বিশ্বায়ন এবং উন্নয়নশীল বাজারগুলোর দ্রুত প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত, সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং সামাজিক উদ্বেগ বৃদ্ধি, গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি যা সমন্বিতভাবে ভোক্তা ও কোম্পানিগুলোকে নতুন ধরণের কিছু সক্ষমতা এনে দিয়েছে। এসব সক্ষমতার সাথে মিল রেখে পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকতে কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য কৌশল প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন করছে। কাজেই শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরির উদ্দেশ্যে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকগণ ভোক্তার উপলব্ধ গুনগত মান অর্জনের লক্ষ্যে এমন পণ্য কৌশল প্রণয়ন করেন যা পণ্য বা সেবাকে বাজারে প্রচলিত অন্যান্য প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের তুলনায় সার্বিক বিবেচনায় এগিয়ে রাখে এবং বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের পর ভোক্তাদের ভোগ অভিজ্ঞতাকে সহজ ও উপভোগ্য করে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে সহায়তা করে। কোম্পানিগুলো তাদের বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ব্যবহার নির্দেশিকা, গ্রাহক সেবা কর্মসূচি এবং আনুগত্য র্কমসূচীকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরি করে।

# পাঠ-৬.৭ মূল্য কৌশল
# Pricing Strategy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মূল্য সম্পর্কে ভোক্তার অভিমত অনুধাবন করতে পারবেন;
- মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অভিমত বিবেচনায় মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণের বিবেচ্য উপাদানগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মূল্য স্থিতিশীলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিপণন মিশ্রণের মধ্যে মূল্যই একমাত্র উপাদান যা কোম্পানিতে অর্থের আগমন ঘটায় এবং একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডের অন্যতম প্রধান সুবিধা হচ্ছে এর মাধ্যমে কোম্পানিসমূহ অধিক মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ পায়। কাজেই মূল্য নির্ধারণ কৌশল সরাসরি ব্র্যান্ডিং এর সাথে জড়িত। এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব, একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ কৌশল কিভাবে ভূমিকা রাখে এবং ভোক্তারা কোন পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে। এছাড়াও মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- রেজর-ব্লেড মূল্য নির্ধারণ কৌশল, ফ্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ কৌশল, 'যতটুকু ব্যবহার, ততটুকু মূল্য' কৌশল ইত্যাদি এবং এসবের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কিছু উপাদান নিয়েও আলোচনা করা হলো যা সরাসরি ব্র্যান্ড ইক্যুইটির তৈরির সাথে জড়িত। সবশেষে, মূল্য স্থিতিশীলতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

## মূল্য সম্পর্কে ভোক্তার অভিমত অনুধাবন
## Understanding Consumer Price Perceptions

ভোক্তারা কিভাবে একটি পণ্য বা সেবার মূল্য সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সে বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কারণ সফল বিপণনের জন্য এটি জানা অতি প্রয়োজন যে ভোক্তারা ঠিক কী পরিমাণ মূল্যকে যথাযথ মনে করে এবং ক্রয় সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রেও তাই মূল্য সম্পর্কে ভোক্তার অভিমত বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। ভোক্তাদের ক্রয় সিদ্ধান্ত নির্ভর করে মূলত পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অভিমতের উপর। এক্ষেত্রে ভোক্তারা দুটি উৎস থেকে মূল্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে থাকে-

১। **অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Frames of Reference)**: অভ্যন্তরীণ উৎস বলতে আসলে ভোক্তার মনের মধ্যে একটি পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে যে ধারণার জন্ম হয় সেটিকে বোঝায়। সেটা বিভিন্ন ভাবে ভোক্তা মনে করতে পারে। হতে পারে সেটা ন্যায্য মূল্য (Fair Price) সম্পর্কে ভোক্তার ব্যক্তিগত মতামত। সর্বশেষ ভোক্তা যে দামে একই অথবা সমজাতীয় পণ্য কিনেছিল, সেই দামের উপর ভিত্তি করেও ভোক্তা মূল্য সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে যা তার ক্রয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

২। **বাহ্যিক উৎস (External Frames of Reference)**: বাহ্যিক উৎস বলতে ভোক্তা বিভিন্ন মাধ্যম হতে পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে যে তথ্য পায় সেটিকে বোঝায়। কোম্পানি নিজেই তার পণ্য বা সেবার মূল্য প্রচার করে থাকে। অন্য একজন ক্রেতার কাছ থেকেও ভোক্তা মূল্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। একজন ভোক্তা বাহ্যিক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ক্রয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ কৌশল নিয়ে কাজ করার সময় মূল্য সম্পর্কে ভোক্তার অভিমতকে প্রভাবিত করার সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে দক্ষ ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকগণ বিকল্প ও সৃজনশীল কৌশল নিয়ে কাজ করেন। যেমন- কোন সেবার বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ৫০০ টাকা কিছু ভোক্তার কাছে উচ্চ মূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটিকে ছোট ছোট ইউনিট যেমন মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করে *'প্রতি মাসে ৫০/- টাকারও কম'* হিসেবে উপস্থাপন করলে তা ভোক্তাদের ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। বেশিরভাগ মূল্যের শেষ অংক ৯ হওয়ার এটা একটা বড় কারণ। যেমন কোন পণ্যের মূল্য ১০০০/- টাকার পরিবর্তে ৯৯৯/- টাকা নির্ধারণ করা হয় যাতে ভোক্তারা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে সেটিকে কম মূল্য হিসেবে মনে করতে পারে এবং ক্রয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

## মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অভিমত ও মূল্য নির্ধারণ

## Consumer Price Perceptions and Setting Prices

মূল্য নির্ধারণ কৌশল ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। ত্রুটিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির অন্তরায়। অপরপক্ষে একটি কৌশলী এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ ব্র্যান্ডকে করে আরও শক্তিশালী। মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যা নির্ভর করে নানাবিধ উপাদানের উপর। এ পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কিছু উপাদান ও মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো যা সরাসরি ব্র্যান্ড ইক্যুইটির সাথে জড়িত।

**১। উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয় (Making and Selling Cost)**: মূল্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন উপাদানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয়। পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার সাথে জড়িত ব্যয়সমূহের উপর নির্ভর করেই প্রাথমিক ভাবে মূল্য সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

**২। প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের মূল্য (Prices of Competing Brands)**: বাজারে প্রচলিত প্রতিযোগী পণ্য বা ব্র্যান্ডের দামের উপরও কোম্পানির পণ্য বা সেবার দাম নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয়ের চাইতেও প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের তুলনামূলক দাম অধিক বিবেচনায় নিয়ে মূল্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

**৩। মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অভিমত (Consumer Price Perceptions)**: আধুনিক বিপণনের যুগে মূল্য নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি আমলে নেয়া হয় মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের নিজস্ব অভিমতকে। একটা পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে বাজারের সাধারণ দামস্তর বিবেচনায় ভোক্তারা যে মূল্যকে যথাযথ মনে করে সেটিকে মাথায় রেখেই পণ্য বা সেবার গুণগত মান ও মূল্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। মূল্য নির্ধারণের এ ধরনের কৌশল ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বাড়াতে সহযোগিতা করে।

**৪। উপলব্ধ গুণগত মান (Perceived Quality)**: একটি পণ্য বা সেবার সার্বিক গুণগত মান সম্পর্কে ভোক্তার মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তাই উপলব্ধ গুণগত মান। এক্ষেত্রে ভোক্তা সাধারণত বাজারে প্রচলিত বিকল্প পণ্য বা সেবার সাথে তুলনা করে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবাকে গুণগত মান বিবেচনায় এগিয়ে রাখে। এই গুণগত মানের উপর নির্ভর করে যে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় ভ্যালু ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ যা ব্র্যান্ডকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

**৫। রেজর-ব্লেড মূল্য নির্ধারণ কৌশল (Razor-Blade Pricing Strategy)**: একটি জনপ্রিয় মূল্য নির্ধারণ কৌশলের নাম হচ্ছে রেজর-ব্লেড মূল্য নির্ধারণ। এই কৌশলে প্রাথমিক বা মূল পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা রেখে সহায়ক পণ্যের দাম বেশি নির্ধারণ করে মুনাফা অর্জন করা হয়। এতে ভোক্তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে বেশি দামে সহায়ক পণ্য কেনে। যেমন- বাংলাদেশের বাজারে *Gillette* তাদের রেজরের একটি উপ-ব্র্যান্ড *Gillette Guard* এর দাম অপেক্ষাকৃত কম রেখে এর ব্লেডের উচ্চমূল্য দিয়ে মুনাফা ঠিক রাখার চেষ্টা করেছে। একইভাবে প্রিন্টারের মূল্য কম রেখে এর টোনারের মূল্য বেশি নির্ধারণ করা, এই ধরনের মূল্য নির্ধারণ কৌশলের উদাহরণ।

**৬। ফ্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ কৌশল (Freemium Pricing Strategy)**: এই মূল্য নির্ধারণ কৌশলটি সাধারণত নতুন ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। এতে প্রথম দিকে ভোক্তাদের কাছে ফ্রি সেবা উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে সেবা প্রদানের জন্য মূল্য ধার্য করে। এই কৌশলে প্রথমে ভোক্তাদের সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত করানো হয় এবং পরবর্তীতে সেবার জন্য মূল্য আরোপ করা হয়।

**৭। 'যতটুকু ব্যবহার, ততটুকু মূল্য' কৌশল (Pay-as-you-wish Pricing Strategy)**: এই মূল্য নির্ধারণ কৌশলে ভোক্তাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়। কোন একটি পণ্য বা সেবার পেছনে তারা কতটুকু অর্থ খরচ করবে তা তারা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারে। মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট ডাটা প্যাক এই ধরনের মূল্য নির্ধারণ কৌশলের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এক কথায়, মূল্য নির্ধারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। ব্র্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মূল্য নির্ধারণ করতে হয় যাতে করে ভোক্তারা বিশ্বাস করতে পারে যে ব্র্যান্ডের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে তা যথাযথ। এতে ভোক্তাদের মূল্য সম্পর্কে অভিমত, পণ্য বা সেবার মান, উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয়সহ অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে জটিল সমীকরণ মাথায় রেখে মূল্য নির্ধারণ করা হয় যা দিন শেষে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

## ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণ

## Value Pricing

ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যের মান, ব্যয় ও মূল্য এবং সেই পণ্য হতে কোম্পানির প্রাপ্ত মুনাফার মধ্যে একটি টেকসই সেতুবন্ধন রচনা করা যা একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে তিনটি উপাদানের মধ্যে একটি সুষম সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়। উপাদান তিনটি নিচে আলোচিত হল-

**১। পণ্য ডিজাইন ও সরবরাহ (Product Design and Delivery)**: ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণের প্রথম শর্তই হচ্ছে পণ্য ডিজাইন ও সরবরাহে উৎকর্ষ সাধন। কেবল একটি উৎকৃষ্ট মান ও ডিজাইনের পণ্যই পারে ভোক্তাদেরকে উচ্চ মূল্যে পণ্য কেনায় আগ্রহী করে তুলতে। উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সেই পথকে আরও সুগম করে তোলে। Apple Inc. এর পণ্য গুলো ভোক্তারা সব সময় উচ্চ মূল্যে কিনতে প্রস্তুত থাকে কেবল এই কারণে।

**২। পণ্য ব্যয় (Product Cost)**: পণ্য ব্যয় কমানো ভ্যালু নির্ভর মূল্য কৌশলের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে ব্যয় হ্রাস করা। এ প্রক্রিয়ায় অপচয় হ্রাস, আউটসোর্সিং, কাঁচামালের বিকল্প উৎস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণের মতো অণুঘটক সমূহ নিয়ে কাজ করতে হয় যাতে করে পণ্য ব্যয় কমানো সম্ভব হয়। পণ্য ব্যয় কমাতে পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ভ্যালু নির্ভর মূল্য কৌশলকে সহজ ও ফলপ্রসূ করে দেয়।

**৩। পণ্য মূল্য (Product Price)**: কোন মানের পণ্যের জন্য কত টাকা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে তা বুঝতে পারা ভ্যালু ভিত্তিক মূল্য কৌশলের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে ভোক্তারা একটি নির্দিষ্ট মানের পণ্যের জন্য ঠিক কী পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে ইচ্ছুক তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে মূল্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এর ফলে একই সাথে ভোক্তা সন্তুষ্টি এবং মুনাফা নিশ্চিত হয়।

## মূল্য স্থিতিশীলতার কারণ
## Reasons for Price Stability

বিক্রয় বাড়ানোর জন্য নানাবিধ প্রসারমূলক মূল্য নির্ধারণ কৌশল থাকলেও অনেক কোম্পানীই মূল্যের স্থিতিশীলতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। যেমন-

- ✓ প্রসারমূলক মূল্য চলাকালীন বিক্রয় বাড়লেও এটির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র হঠাৎ করেই বিক্রয় তলানীতে নেমে যায় যা ব্র্যান্ডের জন্য ক্ষতিকর। এতে করে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ের বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হয় যা যে কোন ব্র্যান্ডকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।
- ✓ আবার একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রসারমূলক মূল্য কৌশল নেয়া হলেও নিয়ম ভেঙ্গে তা অন্য এলাকায় বিক্রয় করা হলে ব্র্যান্ডিং এর মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।
- ✓ সর্বোপরি মূল্যের স্থায়ীত্ত ব্র্যান্ড এর টেকসই গুণগত মানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে ভোক্তাদের মনে একটি আস্থার জায়গা তৈরি যা ব্র্যান্ডকে করে তোলে অধিকতর শক্তিশালী।

এই সমস্ত কারণে অনেক কোম্পানিই সচেতনভাবে মূল্যের স্থায়ীত্ব বা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চায়।

**সারসংক্ষেপ:**

বিপণন মিশ্রণের মধ্যে মূল্যই একমাত্র উপাদান যা কোম্পানিতে অর্থের আগমন ঘটায় এবং একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডের অন্যতম প্রধান সুবিধা হচ্ছে এর মাধ্যমে কোম্পানিসমূহ পণ্যমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিক মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ পায়। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ভোক্তারা কোন পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে তা জানতে হয়। মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যেমন- রেজর-ব্লেড মূল্য নির্ধারণ কৌশল, ফ্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ কৌশল, 'যতটুকু ব্যবহার, ততটুকু মূল্য' কৌশল ইত্যাদি। এসব পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের সময় উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয়, প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের মূল্য, মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অভিমত এবং উপলব্ধ গুণগত মান ইত্যাদি উপাদানের প্রভাব বিবেচনা করতে হয়। মূল্য নির্ধারণের ভ্যালু নির্ভর পদ্ধতিতে পণ্যের ডিজাইন ও সরবরাহ, পণ্য ব্যয়, এবং পণ্য মুল্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। তবে মূল্য কৌশলকে সফল হতে হলে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী।

# পাঠ-৬.৮ বণ্টন প্রণালী কৌশল
# Channel Strategy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- প্রণালী ডিজাইন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অনলাইন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

একটি পণ্য কিভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হচ্ছে, তা সেই পণ্যটির ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ও বিক্রয় সফলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই পণ্যটি কেবল গুণগত মান সম্পন্ন হলেই হবে না, পাশাপাশি একটি ক্রেতা বান্ধব বণ্টন প্রণালীর মাধ্যমে সেটিকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বণ্টন প্রণালী হচ্ছে পরস্পর নির্ভরশীল কিছু প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সমষ্টি যারা ভোক্তার কাছে পণ্য বা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে। এদেরকে বিপণনের ভাষায় মধ্যস্থব্যবসায়ী বা মধ্যস্বত্বভোগী বলা হয়। যেমন- পরিবেশক, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ব্রোকার ইত্যাদি। বণ্টন প্রণালী কৌশল হচ্ছে এসব মধ্যস্থব্যবসায়ীদের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে সহায়তা করে। পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী বলতে এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালীকে বুঝায় যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়। আর প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী বলতে এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালীকে বুঝায় যেখানে কোম্পানি তার নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা অর্পণ করে।

## প্রণালী ডিজাইন
## Channel Design

বণ্টন প্রণালী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে বণ্টন প্রণালীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী (Direct Channel) ও পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী (Indirect Channel)। প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালী যেখানে কোম্পানি তার নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা অর্পণ করে। এটি হতে পারে মেইল, টেলিফোন, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য যে কোন উপায়ে। এক কথায় এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় কোন পক্ষের সহযোগিতা নেয়া হয় না। পরোক্ষ বণ্টন প্রণালীর ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ বা মধ্যস্বত্বভোগী যেমন, পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, এজেন্ট, ব্রোকার ইত্যাদির মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পণ্য বা সেবা পৌঁছানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে বণ্টন প্রণালী কেমন হবে তা নির্ভর করে তুলনামূলক মুনাফা ও ক্রেতা সন্তুষ্টির উপর। স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়াটাই বণ্টন প্রণালী ডিজাইনের মূল কথা। সাধারণত যে সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য সম্পর্কিত তথ্যের গুরুত্ব বেশি, পণ্য কাস্টোমাইজেশন প্রয়োজন বা পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরী, সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী অধিক ফলপ্রসূ। অপরদিকে পণ্যের পরিমাণ প্রচুর হলে, বাজার শেয়ার বেশি হলে এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী বেশি কার্যকর। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কোম্পানিসমূহ একইসাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী ব্যবহার করে। ভোক্তাদের বণ্টন প্রণালী অভিজ্ঞতা সরাসরি ব্র্যান্ড ইক্যুইটির সাথে সম্পর্কিত।

## পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী
## Indirect Channel

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালী যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে রয়েছে পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, এজেন্ট, ব্রোকার ইত্যাদি। তবে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে *'খুচরা বিক্রেতা'* সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরাই চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছাকাছি থাকে। সেক্ষেত্রে ভোক্তাদের পছন্দ, অপছন্দ, অভিযোগ, সন্তুষ্টি সম্পর্কে খুচরা বিক্রেতারাই নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কাজেই ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতাদের গুরুত্ব দিয়ে কৌশল প্রণয়ন করা হয়।

**১। পুশ ও পুল কৌশল (Push & Pull Strategy)**: খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহ দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে। প্রথমটি হল পুল বা টানা কৌশল যার মাধ্যমে ভোক্তাদের পণ্য সম্পর্কে জানানো ও ক্রয়ে আগ্রহী করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় এবং সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় যাতে ভোক্তারা নিজে থেকেই খুচরা বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে পণ্য কেনা নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় সরাসরি ভোক্তাদের উপর।

দ্বিতীয়টি হল পুশ বা ঠেলা কৌশল যার মাধ্যমে কোম্পানিসমূহ মূলত বণ্টন প্রণালীর সদস্যদের বিশেষ করে খুচরা বিক্রেতাদের নানাবিধ আর্থিক, অনার্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে উৎসাহ দেয়। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য থাকে খুচরা বিক্রেতাদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পণ্য বিক্রয় করা।

তবে Colgate, Tide, Ges Folgers এর মত বড় মাপের কোম্পানিসমূহ দক্ষতার সাথে যুগপৎভাবে পুশ ও পুল কৌশল প্রয়োগ করে আসছে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।

**২। প্রণালী সহায়তা (Channel Support)**: ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরিতে বণ্টন প্রণালীর মধ্যস্বত্বভোগীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কাজেই কোম্পানিসমূহ প্রণালী সদস্যদের নানাবিধ উপায়ে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একই সাথে তাদের উৎসাহ প্রদান ও বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে কোম্পানিসমূহ টোল-ফ্রি নাম্বারের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের তথ্য সহায়তা দিয়ে থাকে যা প্রণালী সদস্যদের উপর চাপ কমায়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ও ব্যবহার বিধি উপস্থাপন এই একই উদ্দেশ্যে কোম্পানিসমূহ করে থাকে।

ইদানীং AR (Augmented Reality) এবং VR (Virtual Reality) প্রযুক্তির সাহায্যে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে ভোক্তাদের ক্রয়ের পূর্বেই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে অধিকতর বাস্তব সম্মত ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে যা খুচরা বিক্রেতাদের এবং সর্বোপরি কোম্পানির বিক্রয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। যেমন- নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক পোশাকের গ্লোবাল ব্র্যান্ড Rebecca Minkoff এর AR Mirror এমন এক প্রযুক্তি যার সামনে দাঁড়ালে নতুন কোন পোশাকে ভোক্তাকে কেমন মানাবে সে সম্পর্কে একটি ত্রিমাত্রিক ধারণা দিয়ে দেয়। এর ফলে একজন ভোক্তা তার জন্য সবচে মানাসই পোশাকটি সহজেই খুঁজে নিতে পারে।

এছাড়া প্রণালী সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য জানানো এবং প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রসারে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এ সবই দিন শেষে বিক্রয় বৃদ্ধি এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে অবদান রাখবে।

**৩। খুচরা পণ্য বিভক্তিকরণ (Retail Segmentation)**: খুচরা পণ্যসমূহ ধরন অনুযায়ী আলাদা করার প্রয়োজন পড়ে যা ভোক্তাদের সহজেই কাঙ্ক্ষিত পণ্য খুঁজে নিতে সহায়তা করে। খুচরা পণ্যের বিপণি গুলোতে তো বটেই, অনলাইন রিটেইল সাইটগুলোতেও খুচরা পণ্যসমূহ গুণগত মান, মূল্য, ব্র্যান্ড ভ্যালু ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্তিকরণ করা হয় যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

**৪। যৌথ বিজ্ঞাপন (Cooperative Advertising)**: অনেক সময় উৎপাদনকারী ও খুচরা বিক্রেতা যৌথভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা যে উৎপাদনকারীর পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়, সেই উৎপাদনকারী তাতে শতকরা হিসেবে (সাধারণত ৫০%) বিজ্ঞাপনের ব্যয় যোগান দেয়। এবং এই অর্থ সাধারণত খুচরা বিক্রেতারা উৎপাদনকারীর কাছে থেকে যে নগদ অর্থে পণ্য ক্রয় করে তা থেকে নির্বাহ করা হয়। যৌথ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন খুচরা বিক্রেতা লাভবান হয়, অপরদিকে তেমনি উৎপাদনকারীরও পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

## প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী
## Direct Channel

আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালী যেখানে কোম্পানি তার নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা অর্পণ করে। যেমন- মেইল, টেলিফোন, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য যে কোন উপায়ে কোম্পানি তাদের অভীষ্ট ক্রেতাদের কাছে পণ্য সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করে বিক্রয় প্রচেষ্টা চালায়। এবার প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালীর ধরন এবং এর সাথে জড়িত ব্র্যান্ড ইক্যুইটি সম্পর্কিত বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

**১। কোম্পানির নিজস্ব স্টোর (Company-Owned Store)**: প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালীর অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে কোম্পানির নিজস্ব স্টোর। অনেক বড় বড় কোম্পানি প্রচলিত বণ্টন প্রণালীর পাশাপাশি তাদের নিজস্ব স্টোর চলমান রাখে। কোম্পানির নিজস্ব কর্মী দ্বারা এসমস্ত স্টোর ব্যবস্থাপনা করা হয়। ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি এবং সরাসরি ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন

কোম্পানির নিজস্ব স্টোর বা শো-রুম চালু রাখার মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে কোম্পানি কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন এর মাধ্যমে কোম্পানি তার সব ধরনের পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পায় যায় পরোক্ষ বণ্টন প্রণালীতে সম্ভব নাও হতে পারে। এছাড়া নতুন পণ্য পরিচিতিকরণ ও বিপণনে নিজস্ব স্টোর শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

নিজস্ব স্টোর ব্যবস্থাপনার কিছু অসুবিধাও আছে। অনেক সময় খুচরা বিক্রেতাদের মত দক্ষতা, লোকবল বা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে কোম্পানির নিজস্ব স্টোর ব্যবস্থাপনায় সমস্যা দেখা দেয়। কিছু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পণ্য বিক্রয় করা ব্যয়বহুল হয়ে যেতে পারে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া কোম্পানির নিজস্ব স্টোর এবং প্রচলিত বণ্টন প্রণালীর সদস্যরা পরস্পর সাংঘর্ষিক অবস্থানে চলে যেতে পারে যা ব্র্যান্ডের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

**২। দোকানের ভেতর দোকান (Store-within-a-Store)**: নিজস্ব স্টোরের পাশাপাশি কোম্পানিসমূহ বিভাগীয় বিপণীর (Departmental Store) ভেতর নিজস্ব ব্র্যান্ডের দোকান বা স্টোর চালাতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে বড় বড় শপিং মলের ভেতরে ভাড়ার ভিত্তিতে কোম্পানির নিজস্ব শো-রুম ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করাকে বোঝানো হচ্ছে। এর মাধ্যমেও কোম্পানি তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়াই তাদের ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দিতে পারছে। এক্ষেত্রে কোম্পানি বড় শপিং মলের নিজস্ব ব্র্যান্ডিং এর সুবিধা পায়। এতে করে দ্রুত পরিচিতি বাড়ে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

**৩। অন্যান্য উপায় (Other Means)**: সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বিক্রয়ের আরেকটি উপায় হচ্ছে মেইল, টেলিফোন বা অনলাইনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং পণ্য বিক্রয় করা। এর ফলে নিজস্ব কোন স্টোর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই এবং অতি দ্রুত সরাসরি ভোক্তাদের কাছে ব্র্যান্ডকে পৌঁছে দেয়া যায়। বর্তমানে বেশিরভাগ ব্র্যান্ড এই মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং সফল হচ্ছে। এতে করে অনলাইন বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছে।

### অনলাইন কৌশল

## Online Strategies

কোম্পানির শো-রুমের পাশাপাশি অনলাইন মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা এখন সর্বজনবিদিত। এখনকার ক্রেতারা অত্যন্ত ব্যস্ত এবং সচেতন। যার কারণে অনেকেই অনলাইনে কেনাকাটায় সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অনেকেই এটা পছন্দ করেন যে তিনি নিজে গিয়ে পণ্য নিয়ে আসবেন না, বরং কোম্পানি অনলাইনে অর্ডার করা পণ্য তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে।

দিন দিন অনলাইনে কেনাকাটার এই বিষয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যার কারণে অনেক ব্র্যান্ড সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি অনলাইন মাধ্যমেও পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ রাখছে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে অবদান রাখছে। যেমন- Apex Footwear Limited দেশব্যাপী তাদের শো-রুমের পাশাপাশি *www.apex4u.com* এর মাধ্যমে জুতাসহ অন্যান্য পণ্য বিক্রয় ও ব্র্যান্ডিং করে আসছে।

**সারসংক্ষেপ:**

ব্র্যান্ড ইক্যুইটি এবং বণ্টন প্রণালী কৌশল একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি করার চেষ্টা করে। অপরদিকে পরোক্ষ বণ্টন প্রণালীর মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে পণ্য বিক্রয়ের ফলে ব্র্যান্ডকে সকল ভোক্তার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়। একটি কার্যকরী বণ্টন প্রণালী কৌশল ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির পথে কোম্পানিকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী বলতে এমন এক ধরনের বণ্টন প্রণালীকে বুঝায় যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়। পরোক্ষ বণ্টন প্রণালীতে পুশ ও পুল কৌশল, প্রণালী সহায়তা, খুচরা পণ্য বিভক্তিকরণ, এবং যৌথ বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। আর প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালীতে কোম্পানি তার নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা অর্পণ করে। প্রত্যক্ষ্য বণ্টন কোম্পানির নিজস্ব স্টোর এবং দোকানের ভেতর দোকান কৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।

# পাঠ-৬.৯ যোগাযোগ কৌশল
# Communication Strategy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিপণন যোগাযোগের উপায় সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল বর্ণনা করতে পারবেন;
- একটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের সম্ভাব্য ভুলসমূহ ব্যখ্যা করতে পারবেন;
- একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের ফলে কী অর্জিত হয় তা বলতে পারবেন;
- একাধিক প্রসার উপাদানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিপণন যোগাযোগ কৌশলের বেশ কিছু উপায় রয়েছে। বিপণন যোগাযোগের প্রধানতম উপায় হিসেবে বিজ্ঞাপনকে বিবেচনা করা হলেও অন্যান্য উপায়গুলোও যেমন- ব্যক্তিক বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার, ট্রেড প্রসার, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইভেন্ট মার্কেটিং, স্পন্সরশিপ, পাবলিসিটি ও পাবলিক রিলেশন ইত্যাদি ক্ষেত্র বিশেষে অধিক গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠতে পারে। ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কিভাবে কাজ করে তা যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল থেকে জানা যায়। এই মডেলটি মূলত ছয়টি ধাপের সমন্বয়ে গঠিত হয় যথা- উপস্থিতি, দৃষ্টি আকর্ষণ, বোধগম্য, সাড়া দান, অভিপ্রায় এবং আচরণ। এই ছয়টি ধাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে তবেই বিপণন যোগাযোগ সফল হয় এবং একজন গ্রাহক ব্র্যান্ডের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির পূর্বশর্ত।

## বিপণন যোগাযোগের উপায় সমূহ
## Marketing Communication Options

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি কিভাবে পণ্য, মূল্য এবং বন্টন কৌশল ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এবার দেখা যাক বিপণন প্রসার তথা যোগাযোগ কিভাবে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে অবদান রাখে। বিপণন যোগাযোগ এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে কোম্পানিসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোক্তাদের ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানানো, ক্রয়ে প্ররোচিত করা এবং স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজটি করে থাকে। কাজেই একটি ব্র্যান্ড ভোক্তাদের মনে কতখানি জায়গা দখল করতে পারবে তার অনেকটাই নির্ভর করে সেই ব্র্যান্ডের বিপণন যোগাযোগ কৌশলের উপর।

এ প্রসঙ্গে **Kevin Lane Keller** বলেন, "Marketing communications are the means by which companies attempt to inform, persuade, and remind consumers—directly or indirectly—about the brands they sell." অর্থাৎ, বিপণন যোগাযোগ বলতে এমন উপায়গুলোকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোক্তাদের পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানায়, ক্রয়ে প্ররোচিত করে এবং মনে করিয়ে দেওয়ার কাজটি করে থাকে।

বিপণন যোগাযোগ কৌশলের বেশ কিছু উপায় রয়েছে। বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কোম্পানিসমূহ যুগপৎভাবে একাধিক উপায় অবলম্বন করতে পারে। এক্ষেত্রে যোগাযোগ বাজেট এবং তার অনুপাতে কতোটা যোগাযোগ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব, সে হিসেব মাথায় রাখাটা জরুরী। বিপণন যোগাযোগের প্রধানতম উপায় হিসেবে বিজ্ঞাপনকে বিবেচনা করা হলেও অন্যান্য উপায়গুলোও ক্ষেত্র বিশেষে অধিক গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞাপন ছাড়াও অন্যান্য যোগাযোগের উপায় গুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিক বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার, ট্রেড প্রসার, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইভেন্ট মার্কেটিং, স্পন্সরশিপ, পাবলিসিটি ও পাবলিক রিলেশন ইত্যাদি। ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে বিপণন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন একটি জটিল কাজ। বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহকে কৌশলগত ভাবে কাজে লাগিয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির পথকে সহজ করে দেয়।

## যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল

## Information Processing Model of Communications

ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কিভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকাটা জরুরী। এ ব্যাপারে ধারণা না থাকলে যোগাযোগ কৌশল থেকে আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া যাবে না যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে।

যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল মূলত ছয়টি ধাপের সমন্বয়ে গঠিত। নিচে এই ছয়টি ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১। **উপস্থিতি (Exposer):** বিপণন যোগাযোগ এমন হওয়া উচিৎ যাতে একজন ব্যক্তি (Target Audience) সেটার উপস্থিতি টের পায়। ব্যক্তি যেন তা ঠিকভাবে শুনতে অথবা দেখতে পায়।

২। **দৃষ্টি আকর্ষণ (Attention):** যোগাযোগের বিষয়টি যেন একজন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে যে তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করা হয় সে বিষয়ে যেন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষন করা সম্ভব হয়।

৩। **বোধগম্য (Comprehension):** যোগাযোগের বিষয়টি যেন ব্যক্তির কাছে সহজেই বোধগম্য হয়। তা না হলে যোগাযোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৪। **সাড়া দান (Yielding):** ব্যক্তি যেন যোগাযোগ প্রচেষ্টার প্রতি ইতিবাচকভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

৫। **অভিপ্রায় (Intention):** যোগাযোগ এমন হওয়া চাই যাতে ব্যক্তি যোগাযোগের বিষয়ের প্রতি জোরালো অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

৬। **আচরণ (Behaviour):** এবং চূড়ান্তভাবে একজন ব্যক্তি যেন যোগাযোগের প্রতি তার ইতিবাচক আচরণ প্রকাশ করে তথা পণ্যটি কেনে যার মাধ্যমে যোগাযোগের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

এই ছয়টি ধাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে তবেই যোগাযোগ সফল হয় এবং একজন ব্যক্তি ব্র্যান্ডের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির পূর্বশর্ত। যোগাযোগ কৌশলের উপায়সমূহ নিয়ে কাজ করার সময় এই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল যাতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারলে তবেই একটি ব্র্যান্ড সফলভাবে ভোক্তার নিজের ব্র্যান্ড হয়ে উঠে। নতুবা যোগাযোগ কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ছয়টি ধাপের কোন একটি ধাপের অনুপস্থিতি বা ব্যর্থতা সমগ্র যোগাযোগ কৌশলকেই হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। যেহেতু ব্র্যান্ড যোগাযোগের সবচেয়ে পরিচিত মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞাপন, সেহেতু একটি নতুন বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে এই ছয়টি ধাপের অনুপস্থিতি কী প্রভাব ফেলতে পারে তা পরবর্তী আলোচনায় বোধগম্য হওয়ার কথা।

## একটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের সম্ভাব্য ভুলসমূহ

## Pitfalls in Launching a New Advertising Campaign

বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের বা ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে যে সম্ভাব্য ভুলগুলো হতে পারে এবং তার ফলে যে নেতিবাচক ফলাফল আসে তা নিচে তুলে ধরা হলো-

১। একজন ভোক্তার কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছাতেই পারবে না যদি বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনে ভুল হয়।

২। বিজ্ঞাপনের উপস্থাপনা যদি বিরক্তিকর বা একঘেঁয়ে হয় অথবা সৃষ্টিশীলতার ঘাটতি থাকে, তাহলে তা ভোক্তার দৃষ্টি আকর্ষণে অসমর্থ হবে।

৩। ভোক্তার কাছে একটি বিজ্ঞাপন বোধগম্য নাও হতে পারে যদি সে বিজ্ঞাপনে পণ্য সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা থাকে বা সেই ব্র্যান্ড দুর্বল হওয়ার কারণে সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা কম থাকে।

৪। বিজ্ঞাপনে যদি পণ্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও ভুয়া তথ্য দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপনটি যদি পণ্যের সাথে অপ্রাসঙ্গিক হয় সেক্ষেত্রে ভোক্তারা ইতিবাচক ভাবে সাড়া দিতে তথা পণ্যটি ক্রয় করতে অনীহা প্রকাশ করে।

৫। বিজ্ঞাপন যদি ভোক্তাকে পণ্যটির প্রয়োজন বোঝাতে অসমর্থ হয় তাহলে ভোক্তার মধ্যে সেই পণ্য কেনার অভিপ্রায় তৈরিই হয় না। এবং সে পণ্যটি কেনে না।

৬। শেষ পর্যন্ত ভোক্তা যখন কোন পণ্য ক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে যায় তখন যদি বিজ্ঞাপনের কিছুই তার মাথায় না থাকে তাহলে অন্য অনেক পণ্যের ভীড়ে ভোক্তা হারিয়ে যায় এবং বিজ্ঞাপনটি কোন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে না।

এ সমস্ত ভুলের ঘটনা ঘটলে যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেলের ছয়টি ধাপ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এটি যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি ব্যাহত হয়।

## একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের ফলে কী অর্জিত হয়?

## What an Ideal Ad Campaign Would Ensure?

একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান মূলত যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ছয়টি ধাপেই সুষ্ঠুভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের ফলে ভোক্তার কাছে সঠিকভাবে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছায় যার ফলে ভোক্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পণ্য ক্রয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। নিচে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ধাপ ভিত্তিক আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের অবদানের উপর আলোকপাত করা হলো-

১। একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান সঠিক ভোক্তার কাছে সঠিক বার্তা সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়।

২। আদর্শ বিজ্ঞাপনের সৃষ্টিশীল কৌশলের কারণে ভোক্তারা বিজ্ঞাপনের বার্তা তথা পণ্যের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠে।

৩। এটি ভোক্তার বোঝার সক্ষমতা অনুযায়ী অত্যন্ত সহজভাবে বার্তা উপস্থাপন করে যাতে ভোক্তা অতি সহজেই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে জানতে পারে।

৪। কোন প্রকার অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন না করে এটি পণ্য বা সেবার অন্য পণ্যের সাথে বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ বার্তা প্রদান করে যা ভোক্তাদের আস্থা অর্জনে সহায়তা করে।

৫। এ পর্যায়ে বিজ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত হয়ে ভোক্তারা ক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে।

৬। সবশেষে একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন পণ্য বা ব্র্যান্ডের ব্যাপারে ভোক্তাদের এতোটাই আগ্রহী করে তোলে যে ভোক্তারা চূড়ান্ত ভাবে ক্রয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান এভাবেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ছয়টি ধাপে কাজ করে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে চূড়ান্ত ক্রেতা বা ভোক্তায় পরিণত করে।

## একসাথে একাধিক প্রসার উপাদানের ব্যবহার

## Role/Use of Multiple Communications

একটি পণ্য বা ব্র্যান্ডের কাঙ্ক্ষিত প্রসারের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রসার উপাদান কাজে লাগানো উচিৎ? নিঃসন্দেহে এটি একটি জটিল প্রশ্ন এক কথায় যার উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। একটি কোম্পানি একসাথে ঠিক কতগুলো প্রসার উপাদান ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে বেশ কিছু বিষয়ের উপর। তবে সবার আগে ভেবে দেখা দরকার যে কী পরিমাণ প্রসার বাজেটের বিপরীতে কী পরিমাণ রিটার্ন আসছে। অপরিকল্পিত প্রসার কার্যক্রম প্রায়শই কোম্পানির অর্থের অপচয় ঘটায় যা কাম্য নয়। এক্ষেত্রে প্রসার বাজেট কী পরিমাণ হবে তথা কোন কোন প্রসার উপাদান কাজে লাগানো হবে তা নির্ধারণে নিচের বিষয় সমূহ বিবেচনা করতে হয়-

- ✓ ব্র্যান্ড বা পণ্যটি তার জীবন চক্রের ঠিক কোন ধাপে অবস্থান করছে। সাধারণত সূচনা ধাপে একাধিক প্রসার উপাদানের প্রয়োজন হয়।
- ✓ কোম্পানির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য।
- ✓ কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা।
- ✓ পণ্যের বৈশিষ্ট্য। ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে একাধিক প্রসার উপাদান ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।
- ✓ প্রতিযোগী কোম্পানি সমূহের প্রসার কৌশল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবেই প্রসার বাজেট বেশি প্রয়োজন হয় তথা একাধিক প্রসার উপাদান ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে কেবল একটি প্রসার উপাদানে বিনিয়োগ বিক্রয় বৃদ্ধিতে খুব একটা অবদান রাখতে পারে না। একাধিক প্রসার উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হতে পারে নিম্নরূপ-

- ✓ বণ্টন প্রণালী দুর্বল হলে।
- ✓ বিপণন কার্যক্রমের বারবার পরিবর্তন ঘটলে।
- ✓ ভোক্তার কাছে বার্তা পৌঁছানো কষ্টকর হলে।
- ✓ ভোক্তা ক্রয় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া জটিল হলে।
- ✓ পণ্যের প্রকারভেদে অত্যধিক বৈচিত্র থাকলে।
- ✓ ভোক্তার প্রয়োজনে অত্যধিক বৈসাদৃশ্য থাকলে।

একাধিক প্রসার উপাদান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উপাদান নির্ধারণ করতে হয় যাতে করে অপচয় না হয় আবার প্রতিটি অভীষ্ট ক্রেতা যেন প্রসার কার্যক্রমের আওতায় আসে। এক্ষেত্রে একজন দক্ষ ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক একাধিক প্রসার উপাদান প্রয়োগের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বৃদ্ধির পথকে সুগম করে তোলেন।

**সারসংক্ষেপ:**

ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে বিপণন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন একটি জটিল কাজ। বিপণন যোগাযোগের মূল উপায় হিসেবে বিজ্ঞাপনকে বিবেচনা করা হলেও ব্যক্তিক বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার, ট্রেড প্রসার, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইভেন্ট মার্কেটিং, স্পন্সরশিপ, পাবলিসিটি ও পাবলিক রিলেশন ইত্যাদি ক্ষেত্র বিশেষে অধিক গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠতে পারে। বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহকে কৌশলগত ভাবে কাজে লাগিয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির পথকে সহজ করে দেয়। ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কিভাবে কাজ করে তা যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল থেকে জানা যায়। যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেলটি মূলত ছয়টি ধাপের সমন্বয়ে গঠিত হয় যথা- উপস্থিতি, দৃষ্টি আকর্ষণ, বোধগম্য, সাড়া দান, অভিপ্রায় এবং আচরণ। যোগাযোগ কৌশলের উপায়সমূহ নিয়ে কাজ করার সময় এই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল যাতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারলে তবেই একটি ব্র্যান্ড সফলভাবে ভোক্তার নিজের ব্র্যান্ড হয়ে উঠে। কোম্পানিগুলো অনেকসময় একইসাথে একাধিক প্রসার উপাদান ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত বণ্টন প্রণালী দুর্বল হলে, বিপণন কার্যক্রমের বারবার পরিবর্তন ঘটলে, ভোক্তার কাছে বার্তা পৌঁছানো কষ্টকর হলে, পণ্যের প্রকারভেদে অত্যধিক বৈচিত্র থাকলে কিংবা ভোক্তার প্রয়োজনে অত্যধিক বৈসাদৃশ্য থাকলে ব্র্যান্ড যোগাযোগের জন্য একাধিক প্রসার উপাদান ব্যবহার করতে হয়।

# পাঠ-৬.১০ বিপণন যোগাযোগের উপায়সমূহ
# Marketing Communication Options

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিপণন যোগাযোগের প্রধান উপায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কার্যকর বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনের উপাদান সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিক্রয় প্রসার কী তা বলতে পারবেন;
- ইভেন্ট স্পন্সরশীপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড পরিবর্ধক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ কার্যক্রমের মানদন্ড গুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ নির্ধারণের মানদন্ড কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিপণন যোগাযোগের বহুল ব্যবহৃত চারটি উপায় হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও প্রসার, মিথস্ক্রিয়া বিপণন এবং ইভেন্ট ও অভিজ্ঞতা এবং মোবাইল বিপণন। বিজ্ঞাপন বলতে একটি চিহ্নিত উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে ধারণা, পণ্য ও সেবার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রসারকে বুঝায়। আর বিক্রয় প্রসার হলো স্বল্পমেয়াদে পণ্য বা সেবার বিক্রয় বাড়ানোর জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিপণন কার্যক্রমের সমষ্টি। মিথস্ক্রিয়া মার্কেটিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অডিও, ভিডিও, তথ্য চিত্র, গেমস, ব্লগিং, ই-মেইল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ড এবং ভোক্তার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। বিপণনে ইভেন্ট বলতে মূলত বিশেষ কোন ঘটনা, উৎসব বা মেলা ইত্যাদিকে বোঝায় যেখানে কোন ব্র্যান্ডের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অপরদিকে বিপণনে 'অভিজ্ঞতা' কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তাকে কোন একটা বিশেষ কাজ হাতে কলমে করিয়ে ব্র্যান্ডের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও যেহেতু ভোক্তাদের হাতে হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে গেছে এবং স্মার্টফোন ভোক্তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে তাই মোবাইলে বিজ্ঞাপন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিক্রয় প্রসার ভোক্তা প্রসার এবং ট্রেড বা বাণিজ্যিক বিক্রয় প্রসার হতে পারে। ব্র্যান্ড পরিবর্ধক হলো কিছু বিপণন যোগাযোগ উপাদান যা গতানুগতিক প্রসার কার্যক্রম তথা বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রসার, ব্যক্তিক বিক্রয় ইত্যাদির প্রভাবকে অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করে। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে-জণসংযোগ ও পাবলিসিটি বা প্রচার এবং ওয়ার্ড অব মাউথ বিপণন। বিপণন যোগাযোগ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কৌশলগতভাবে বিপণন যোগাযোগের সাথে জড়িত বিভিন্ন উপাদান, পক্ষ, কনটেন্ট, চ্যানেল এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা করাকে সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ বলে। সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের ছয়টি মানদন্ড রয়েছে যা সংক্ষেপে 6Cs নামে পরিচিত। এগুলো হলো Coverage (পরিধি), Contribution (অবদান), Commonality (সাদৃশ্য), Complementary (পরিপূরক), Conformability (সংগতিপূর্ণ), এবং Cost (ব্যয়)।

## প্রধান বিপণন যোগাযোগ উপায়সমূহ

### Major Marketing Communication Options

বিপণন যোগাযোগের সর্বাধিক ব্যবহৃত চারটি উপায় হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও প্রসার, মিথস্ক্রিয়া বিপণন এবং ইভেন্ট ও অভিজ্ঞতা এবং মোবাইল বিপণন। নিম্নে এই বিকল্পগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

**১। বিজ্ঞাপন ও প্রসার (Advertising & Promotion) :** একটি চিহ্নিত ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে ধারণা, পণ্য ও সেবার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রসারকে বিজ্ঞাপন বলে। বিজ্ঞাপন একটি একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভোক্তাদের কাছে পণ্যের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটি একটি শক্তিশালী বিপণন প্রসার উপাদান। যদিও ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে এর অবদান পরিমাপ করা কঠিন, তবু একটি ব্র্যান্ডকে ভোক্তাদের কাছে পরিচিত করার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে ব্র্যান্ড ইমেজ ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বিকল্প নেই।

বিজ্ঞাপন ও প্রসারের বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে। এসব মাধ্যমের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞাপন কতোটা ফলপ্রসূ হবে। বিজ্ঞাপন ও প্রসারের মাধ্যম গুলো নিম্নরূপ-

- ✓ টেলিভিশন

- ✓ রেডিও
- ✓ প্রিন্ট মিডিয়া
- ✓ সরাসরি যোগাযোগ (ইমেইল, ওয়েবসাইট, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে)
- ✓ স্থানভিত্তিক মাধ্যম (বিলবোর্ড, পোস্টার, সাইনবোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে) ইত্যাদি।

অতীতের ন্যায় এখনো টেলিভিশন একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় যেখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পণ্য ও সেবা সম্পর্কে বিভিন্ন বার্তা উপস্থাপন করা যায়। কাজেই ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের অবদান অন্যতম। রেডিও বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে থাকলেও এক সময় এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন মাধ্যম হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রিন্ট মিডিয়ার পরিধি আগের তুলনায় সঙ্কুচিত হয়ে আসলেও পত্রিকাগুলোর ইলেকট্রনিক ভার্সন *(e-paper)* এখনো এটিকে কার্যকর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইমেইল এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদানের কৌশলটি বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে অন্যতম প্রসার কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সব শেষে বিলবোর্ড, পোস্টার বা সাইনবোর্ডের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ধারণাটি এখনো কার্যকর আছে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

বিক্রয় প্রসার হলো স্বল্পমেয়াদে পণ্য বা সেবার বিক্রয় বাড়ানোর জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিপণন কার্যক্রমের সমষ্টি। বিক্রয় প্রসার হলো এমন একটি স্বল্পমেয়াদী কার্যকলাপ অথবা উপাদান যা পুনঃবিক্রেতা, বিক্রয় কর্মী বা ভোক্তাদের কাছে পণ্য ক্রয়ের জন্য সরাসরি প্ররোচনা, অফার, উদ্দীপনা বা ভ্যালু সংযোজন হিসেবে কাজ করে। তার মানে, বিক্রয় প্রসার একটি উদ্দীপক সরঞ্জাম যা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রাহকদের ক্রয়ের কারন তৈরি করা যদি বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে বিক্রয় প্রসারের লক্ষ্য হলো পণ্য কেনার জন্য গ্রাহকদের মধ্যে একটি উদ্দীপনা তৈরি করা। বিক্রয় প্রসার প্রধানত ভোক্তা বা বাণিজ্যিক বিক্রয় প্রসার হিসাবে চালু করা যেতে পারে। বিক্রয় প্রসারের ভোক্তা প্রণোদনা হতে পারে নমুনা, কুপন, বিনামূল্যে ট্রায়াল এবং প্রদর্শন ইত্যাদি; বানিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রণোদনা হতে পারে মূল্য হ্রাস, বিনামূল্যের পণ্য এবং ভাতা ইত্যাদি; এবং বিক্রয়কর্মীর বা দলের প্রণোদনা হতে পারে সম্মেলন, ট্রেড শো, বিক্রয় কর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

**২। মিথস্ক্রিয়া মার্কেটিং (Interactive Marketing) :** তথ্য প্রযুক্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষের এই যুগে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি  বাড়ানোর মোক্ষম একটা উপায় হচ্ছে মিথস্ক্রিয়া মার্কেটিং। মিথস্ক্রিয়া মার্কেটিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অডিও, ভিডিও, তথ্য চিত্র, গেমস, ব্লগিং, ইমেল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ড এবং ভোক্তার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। এর ফলে সরাসরি ভোক্তাদের কাছ থেকে ব্র্যান্ড সম্পর্কে তাদের ভালো লাগা বা মন্দ লাগার ব্যাপারে জানা সম্ভব হয় যা ব্র্যান্ডকে আরও শক্তিশালী করার রসদ যোগায়।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ব্র্যান্ডের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফ্যান পেইজ রয়েছে যার মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই সাথে ভোক্তারাও তাদের মতামত, আগ্রহ, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। এভাবেই মিথস্ক্রিয়া মার্কেটিং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে সহায়তা করছে।

**৩। ইভেন্ট ও অভিজ্ঞতা (Event and Experience) :** বিপণনে ইভেন্ট বলতে মূলত বিশেষ কোন ঘটনা, উৎসব বা মেলা ইত্যাদিকে বোঝায় যেখানে কোন ব্র্যান্ডের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইভেন্ট অনলাইন এবং অফলাইন দুটি মাধ্যমেই হতে পারে। বর্তমানে ই-কমার্স সাইট গুলোতে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ইভেন্ট তৈরি করে ব্র্যান্ড গুলোর প্রসার করতে দেখা যায়। এতে ব্র্যান্ডের সাথে ভোক্তাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে কাজে লাগে। অপরদিকে বিপণনে 'অভিজ্ঞতা' কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তাকে কোন একটা বিশেষ কাজ হাতে কলমে করিয়ে ব্র্যান্ডের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে ভোক্তারা ব্র্যান্ড অভিজ্ঞতাকে দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারেন যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

**৪। মোবাইল বিপণন (Mobile Marketing):** সাম্প্রতিক সময়ে ব্র্যান্ড যোগাযোগের চতুর্থ একটি ধরণ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতের ব্র্যান্ড যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার অন্যতম নির্ধারক হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা যায়। এটি হলো মোবাইল বিপণন। যেহেতু ভোক্তাদের হাতে হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে গেছে এবং স্মার্টফোন ভোক্তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাই মোবাইলে বিজ্ঞাপন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিপুল পরিমাণ গ্রাহক বর্তমানে পণ্য কেনাকাটা এবং দাম পরিশোধের জন্য মোবাইল ব্যবহার করছেন। অনেক কোম্পানি মোবাইল ফোনে অর্ডার বা দাম পরিশোধের জন্য বিশেষ ছাড় দিয়ে বিক্রয় বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে।

## কার্যকর বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনের উপাদান সমূহ

**Factors in Designing Effective Advertising Campaign**

বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনে মূলত দুই ধরনের কৌশলকে কাজে লাগানো হয়। প্রথমত পজিশনিং কৌশল যেখানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত বিশেষ কিছু তথ্য ভোক্তাদের জানানোর চেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমেই আসলে বাজারে প্রচলিত প্রতিযোগী ব্র্যান্ড থেকে কোম্পানির ব্র্যান্ডকে আলাদা করা হয়। দ্বিতীয়ত সৃজনশীল কৌশল যার মানে হচ্ছে কিভাবে এবং কতোটা আকর্ষণীয়ভাবে বিজ্ঞাপনটি ভোক্তাদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। এই দুটি কৌশলকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু উপাদান যা বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়। **John R. Rossiter** এবং **Larry Percy** এর মতে একটি কার্যকর বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইনের উপাদানসমূহ নিম্নরূপ-

**১। ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির জন্য পজিশনিং কৌশল নির্ধারণ (Define Positioning to Establish Brand Equity):**

(ক) প্রতিযোগিতামূলক রেফারেন্স ফ্রেম **(Competitive frame of reference):**

-প্রতিযোগিতার ধরন
-অভীষ্ট বাজার

(খ) সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা **(Point-of-parity attributes or benefits):**

-ক্যাটাগরি
-প্রতিযোগিতামূলক
-পারস্পরিক সম্পর্ক

(গ) বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা **(Point-of-difference attributes or benefits):**

-আশানুরূপ
-প্রেরণ যোগ্য
-পার্থক্যসূচক

**২। পজিশনিং যোগাযোগের জন্য উদ্ভাবনী কৌশল চিহ্নিতকরণ (Identify Creative Strategy to Communicate Positioning Concept):**

(ক) তথ্যভিত্তিক কৌশল **(Informational (benefit elaboration)):**

-সমস্যা ও সমাধান
-প্রদর্শন
-পণ্য তুলনাকরণ
-পণ্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ প্রশংসা

(খ) রুপান্তর কৌশল **(Transformational (imagery portrayal)):**

-গতানুগতিক অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবহার অবস্থা
-গতানুগতিক অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী পণ্য ব্যবহারকারী
-ব্র্যান্ড পারসোনালিটি

(গ) প্রেষণাভিত্তিক কৌশল **(Motivational ("borrowed interest" techniques)):**

-কৌতুকদীপ্ত
-উষ্ণতাব্যঞ্জক
-সেক্স অ্যাপিল
-সঙ্গীত
-ভয়
-বিশেষ প্রভাব

মূলত এই উপাদান সমূহই একটি কার্যকর বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে অবদান রাখে।

## বিক্রয় প্রসার

## Sales Promotion

বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত্ব স্বল্পমেয়াদি প্রণোদনাকে বিক্রয় প্রসার বলে। এটি দুইভাবে প্রদান করা যেতে পারে। সরাসরি চূড়ান্ত ভোক্তাদের ডিসকাউন্ট, একটা কিনলে একটা ফ্রি জাতীয় অফারের মাধ্যমে প্রণোদনা দেয়া যায়। অথবা চ্যানেল সদস্য তথা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের আর্থিক বা অনার্থিক প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। দুই ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে কিছু বাড়তি সুবিধা প্রদান করে বিক্রয় বাড়ানো। কাজেই বিজ্ঞাপন যেখানে ভোক্তাদের সামনে পণ্য বা সেবা ক্রয় করার যৌক্তিক কারণ উপস্থাপন করে, সেখানে বিক্রয় প্রসার প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষকে বিক্রয় বাড়াতে উৎসাহিত করে। এবার বিক্রয় প্রসারের দুটি উল্লেখযোগ্য ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

**(ক) ভোক্তা প্রসার (Consumer Promotion):** বিক্রয় প্রসার কার্যক্রমের আওতায় যখন সরাসরি চূড়ান্ত ভোক্তাদের বিভিন্ন উপায়ে প্রণোদনা দেয়া হয় তখন সেটিকে বলে ভোক্তা প্রসার। বহুল ব্যবহৃত ভোক্তা প্রসার কার্যক্রমের মধ্যে স্যাম্পল বিতরণ, ডিসকাউন্ট, ফ্রি পণ্য অফার, রিফান্ড বা ক্যাশ ব্যাক অফার ইত্যাদি।

ভোক্তা প্রসারের মাধ্যমে মূলত ভোক্তাদের কিছু বাড়তি সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে তাদের ক্রয় সিদ্ধান্ত, পছন্দ, ক্রয়ের পরিমাণ, ক্রয়ের সময় ইত্যাদিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের বিক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যেমন ডিসকাউন্ট বা মূল্য ছাড় অফার চলা অবস্থায় অনেক ভোক্তারা পণ্য বা সেবা কেনার ইচ্ছে না থাকলেও কেবল কিছু বাড়তি সুবিধা পাবার আশায় শেষ পর্যন্ত ক্রয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এতে করে একদিকে যেমন বিক্রয় বাড়ে, তেমনি একই সাথে ব্র্যান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধির ফলে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি হয়।

**(খ) ট্রেড বা বাণিজ্যিক বিক্রয় প্রসার (Trade Promotion):** ট্রেড প্রসার হচ্ছে এক ধরনের আর্থিক সুবিধা যা বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশক, ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং অন্যান্য চ্যানেল সদস্যদের দেয়া হয় যাতে করে তারা একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের বিক্রয় বৃদ্ধিতে কাজ করতে আগ্রহী হতে পারে। ট্রেড প্রসার কার্যক্রম বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। যেমন আর্থিক প্রণোদনা, পণ্য প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা আয়োজন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রমোদ ভ্রমণ, ট্রেড শো ইত্যাদি। ট্রেড প্রসার ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে বিশেষ করে নতুন ব্র্যান্ডের পরিচিতিকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চ্যানেল সদস্যগণ তাঁদের ব্যবসায়িক সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন ব্র্যান্ডকে ভোক্তাদের কাছে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। এতে ভোক্তারা নতুন ব্র্যান্ডের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে ক্রয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

অপরদিকে ট্রেড প্রসার কার্যক্রমের অনুপস্থিতি নতুন ব্র্যান্ড পরিচিতিকরণের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রথম বাধা আসে স্বয়ং চ্যানেল সদস্যগণের কাছ থেকেই। যে পণ্য বিক্রয় করলে চ্যানেল সদস্যদের সুবিধা প্রাপ্তির আশা কম, সেই পণ্যের ব্যাপারে আগ্রহ কম থাকাটাই স্বাভাবিক। কাজেই ব্র্যান্ড পরিচিতিকরণ এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে ট্রেড প্রসারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

## ইভেন্ট স্পন্সরশীপের যৌক্তিকতা

## Rationale of Event Sponsorship

ইভেন্ট স্পন্সরশীপ বলতে কোন একটা বিশেষ ইভেন্টে কোম্পানি বা ব্র্যান্ডের স্পন্সরশীপ ক্রয়কে বোঝায় যার মাধ্যমে সেই কোম্পানি বা ব্র্যান্ড উক্ত ইভেন্টের সঙ্গে জড়িত এবং আগ্রহী বহু সংখ্যক বর্তমান ও সম্ভাব্য ভোক্তাদের লক্ষ্য করে তাদের প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার অর্জন করে। ইভেন্ট স্পন্সরশীপ একটি জনপ্রিয় ও ফলপ্রসূ প্রসার কৌশল। নিচে ইভেন্ট স্পন্সরশীপের যৌক্তিকতা বা কারণ সমূহ আলোচনা করা হলো-

**১। বিশেষ শ্রেণির অভীষ্ট বাজার (Particular Target Market)ঃ** প্রতিটি ইভেন্ট এক একটি বিশেষ শ্রেণির অভীষ্ট বাজার। যেমন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার দর্শকরা সাধারণত ক্রীড়া প্রেমি, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ফুটবল প্রেমি। কাজেই এই ইভেন্টটি ক্রীড়া প্রেমি তথা ফুটবল প্রেমি ভোক্তাদের নিয়ে গঠিত একটি অভীষ্ট বাজার যা স্পোর্টস ব্র্যান্ডগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

**২। ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি (Positive Brand Perception)ঃ** কোন বিশেষ ইভেন্টে আগ্রহী ভোক্তারা সে ইভেন্টে স্পন্সরকারী ব্র্যান্ডগুলোর ব্যাপারে একটা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন যা পরবর্তীতে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে অবদান রাখে।

**৩। ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরিতে সুবিধা (Creating Brand Image)ঃ** ইভেন্টের সাথে ব্র্যান্ডের নাম জড়িত হওয়ার ফলে ইভেন্টের পাশাপাশি খুব সহজেই ভোক্তারা স্পন্সর ব্র্যান্ড গুলোকে স্মরণ করতে পারে। এতে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি সহজ হয়। যেমন বিশ্বকাপ ফুটবলের যে কোন আসরে কোন খেলোয়ার পরিবর্তনের চিত্র কল্পনায় এলেই বিশ্ববিখ্যাত সুইস ঘড়ির ব্র্যান্ড Hublot এর কথা মাথায় আসে। কারণ Hublot দীর্ঘদিন ধরে ফিফা বিশ্বকাপের টাইম কিপার স্পন্সর হিসেবে কাজ করে আসছে।

**৪। ক্রয় সিদ্ধান্তে প্রভাব (Influencing Purchase Decision)ঃ** কেবল ইভেন্ট প্রিয়, তাই সে ইভেন্টে যে ব্র্যান্ড গুলো স্পন্সর করেছিলো, কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে গেলে অভীষ্ট ভোক্তারা সেই ব্র্যান্ডকেই ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে রাখে। তাই ইভেন্ট স্পন্সরশীপ ভোক্তাদের ব্র্যান্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলে।

**৫। এক্সপেরিয়ান্স মার্কেটিং এর অংশ (Part of an Experiential Marketing)ঃ** ইভেন্ট একই সাথে এক্সপেরিয়ান্স মার্কেটিং এর অংশ হিসেবে কাজ করে। কারণ প্রতিটি ইভেন্ট ভোক্তাদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই সে অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত ব্র্যান্ডকে ভোক্তারা দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে।

**৬। সামাজিক উন্নয়নে অবদান (Promoting Social Development)ঃ** অনেক সামাজিক উন্নয়ন বা সমাজ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে ব্র্যান্ডগুলো স্পন্সর করে থাকে। এতে করে জনমনে সেই ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠে এবং ভোক্তারা তাদের আবেগের সাথে ব্র্যান্ডকে যুক্ত করে ফেলে। এতে ব্র্যান্ড আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

**৭। ভোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান (Entertain Key Clients)ঃ** অনেক ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড যে ইভেন্টে স্পন্সর করে, সেখানে উক্ত ব্র্যান্ডের ভোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে করে ভোক্তারা ব্র্যান্ডের প্রতি আরও বেশি আস্থাশীল এবং অনুগত হয়ে পড়ে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরিতে সহায়তা করে।

**৮। তাৎক্ষণিক বিক্রয় (Triggering Instatnt Sales)ঃ** অনেক ইভেন্টে স্পন্সরকারী ব্র্যান্ডের পণ্য বা সেবার তাৎক্ষণিক বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভোক্তারা আগ্রহী হয়ে উক্ত ব্র্যান্ডের পণ্য বা সেবা তাৎক্ষণিকভাবেই ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এ সমস্ত কারণেই ইভেন্ট স্পন্সরশীপকে একটি অন্যতম কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রসার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

## ব্র্যান্ড পরিবর্ধক

## Brand Amplifiers

ব্র্যান্ড পরিবর্ধক হলো কিছু বিপণন যোগাযোগ উপাদান যা গতানুগতিক প্রসার কার্যক্রম তথা বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদির প্রভাবকে অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করে। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে-

**(ক) জনসংযোগ ও পাবলিসিটি বা প্রচার (Public Relations and Publicity):** একটি কোম্পানির পণ্য বা ব্র্যান্ডের ব্যাপারে জনসাধারণের মাঝে ইতিবাচক ধারণা বা ইমেজ তৈরির জন্য গণসংযোগ ও পাবলিসিটি করা হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন প্রেস রিলিজ, মিডিয়া ইন্টারভিউ, প্রেস কনফারেন্স, ফিচার আর্টিকাল, নিউজ লেটার, ফটোগ্রাফ, ফিল্ম, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি। এর ফলে মূলত বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় প্রসার ধরনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার চেষ্টা করা হয়।

**Kotler & Armstrong** -এর মতে, "Public relations (PR) is building good relations with the company's various publics by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image and handling or heading off unfavorable rumors, stories and events." অর্থাৎ, জনসংযোগ (PR) হলো কোম্পানির বিভিন্ন জনসাধারণের সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরি করে অনুকূল প্রচার লাভ করা, একটি ভাল কর্পোরেট ইমেজ তৈরি করা এবং প্রতিকূল গুজব, গল্প এবং ঘটনাগুলোকে দূর করা।

**Belch & Belch**-এর মতে, "Publicity refers to nonpersonal communications regarding an organization, product, service or idea that is not directly paid for or run under identified sponsorship." অর্থাৎ, প্রচার বলতে একটি সংস্থা, পণ্য, সেবা বা ধারণা সম্পর্কিত এমন একটি অব্যক্তিগত যোগাযোগকে বোঝায় যেটির জন্য সরাসরি অর্থ প্রদান করা হয় না বা নির্দিষ্ট উদ্যোক্তার অধীনে পরিচালিত হয় না।

এছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে ব্র্যান্ডকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইমেজ ও ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কেবল ইতিবাচক ইমেজ তৈরিই নয়, গণসংযোগ ও পাবলিসিটি ব্র্যান্ড সম্পর্কে যে কোন ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা, গুজব, অপপ্রচার ইত্যাদি রুখে দিতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

**(খ) ওয়ার্ড অব মাউথ বা মুখের কথায় বিপণন। (Word of Mouth):** একজন ভোক্তা কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করার পর ভালো লাগা বা মন্দ লাগা সাধারণত অন্যের কাছে প্রকাশ করে। এই বিষয়টি অন্যদের মাঝে সেই ব্র্যান্ড সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি করে দেয় যা ব্র্যান্ড ইমেজের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ ভোক্তাদের মুখে মুখে ব্র্যান্ড সম্পর্কে যে মন্তব্য ঘুরে বেড়ায় তাই হচ্ছে ওয়ার্ড অব মাউথ বা মুখের কথায় বিপণন। ভোক্তারা যে কোন পণ্য বা সেবা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রথমেই পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধুদের স্মরণাপন্ন হয়। কাজেই এই শ্রেণির কাছে ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করাটা একটা চ্যালেঞ্জ।

যদিও ওয়ার্ড অব মাউথ কোন অর্থ প্রদত্ত প্রসার মাধ্যম নয়, তবু আধুনিক বিপণনের যুগে এ ক্ষেত্রেও অর্থের সংশ্লেষ লক্ষ্য করা যায় যাকে বলা হচ্ছে Influencer Marketing. এর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যারে ফ্যান ফলোয়ার বেশি তাদের মাধ্যমে ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিবাচক ওয়ার্ড অব মাউথ ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বিনিময়ে তাদের আর্থিক সুবিধা বা ফ্রি পণ্য প্রদান করা হয়। ই-কমার্স সাইটে ব্র্যান্ড সম্পর্কে অনেক সময় পেইড কাস্টোমার রিভিউ দেয়া হয় যাতে করে অন্য ভোক্তারা পণ্যটি কেনার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে।

### সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের মানদন্ড

## Criteria for Integrated Marketing Communication (IMC) Programme

সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কৌশলগতভাবে বিপণন যোগাযোগের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ, কনটেন্ট, চ্যানেল এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা করা হয় যাতে বিপণন যোগাযোগ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের ছয়টি মানদন্ড রয়েছে যা সংক্ষেপে 6Cs নামে পরিচিত। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১। **Coverage (পরিধি)ঃ** পরিধি বলতে ঠিক কী পরিমাণ দর্শক বা শ্রোতা বিপণন যোগাযোগের আওতায় এলো সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা কী পরিমাণ ভোক্তার নিকট বার্তা পৌঁছানো সম্ভব সে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়। এটি সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের একটি অন্যতম মানদন্ড।

২। **Contribution (অবদান)ঃ** অবদান বলতে একটি বিপণন যোগাযোগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভোক্তাদের মাঝে ঠিক কী পরিমাণ ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা সম্ভব হয়েছে সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে যে যোগাযোগ মাধ্যম যত বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে, সেটি তত বেশি কার্যকর বলে গণ্য হবে।

৩। **Commonality (সাদৃশ্য)ঃ** বিপণন যোগাযোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। কিন্তু সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের একটি অন্যতম মানদন্ড হচ্ছে বিপণনের বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে ব্র্যান্ড সম্পর্কে একটি একক বৈশিষ্ট্য বা মিল থাকতে হবে। এতে করে ভোক্তাদের মনে ব্র্যান্ড সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র বা স্থায়ী ধারণা তৈরি হবে যা ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির জন্য জরুরী।

৪। **Complementary (পরিপূরক)ঃ** সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রাম হবে একে অন্যের পরিপূরক। এখানে যতগুলো বিপণন যোগাযোগের উপায় ব্যবহার করা হোক না কেন, প্রতিটি কার্যক্রম অন্যান্য সকল কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার শর্তে কাজ করবে যাতে ভোক্তাদের কাছে ব্র্যান্ড সম্পর্কে এক ও অভিন্ন বার্তা পৌঁছায়।

৫। **Conformability (সংগতিপূর্ণ)ঃ** একটি সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রাম এমন প্রকৃতির হওয়া দরকার যা সকল শ্রেণি পেশার ভোক্তাদের জন্য সমান ভাবে কার্যকরী ও সংগতিপূর্ণ হতে পারে। কিছু ভোক্তা হয়তো আগে থেকেই ব্র্যান্ড সম্পর্কে জেনে থাকতে পারে। আবার কিছু ভোক্তা পাওয়া যাবে যাদের নির্দিষ্ট কোন ব্র্যান্ড সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এই দুই শ্রেণির ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখেই সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে।

৬। **Cost (ব্যয়)ঃ** আগের সমস্ত মানদন্ড তখনই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হবে, যখন সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের ব্যয় বা খরচ হবে যথাযথ এবং খরচের বিপরীতে ফলাফল আসবে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। যথা সম্ভব স্বল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক ভোক্তাদের কাছে ব্র্যান্ড সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দেয়াই সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য।

### সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ নির্ধারণের মানদন্ড ব্যবহার

## Using IMC Choice Criteria

সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রাম ডিজাইনে আলোচ্য মানদন্ড পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে দুটি ধাপ রয়েছে-

**১। যোগাযোগের বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন (Evaluating Communication Options):** প্রথমে সমন্বিত বিপণন যোগাযোগের যে বিকল্প মাধ্যম বা প্রকারভেদ রয়েছে সেগুলো মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যয়, প্রভাব, শক্তিশালী ও দুর্বল দিক সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে কার্যকরী

যোগাযোগ মাধ্যম বা মাধ্যমসমূহ নির্ধারণ করতে হয়। পণ্য বা সেবার ধরন এবং ভোক্তাদের শ্রেণি অনুযায়ী যে যোগাযোগ মাধ্যমকে অধিকতর ফলপ্রসূ মনে হবে, অনেকগুলো বিকল্প থেকে সেই যোগাযোগ মাধ্যমকেই বেছে নিতে হবে।

**২। অগ্রাধিকার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা (Establishing Priorities and Trade-offs):** যোগাযোগের বিকল্প সমূহ মূল্যায়নের পর সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর মধ্য হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এক বা একাধিক যোগাযোগ উপায়কে বেছে নেয়া হয়। যেহেতু বিকল্প সমূহ একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কাজেই বিকল্প সমূহের মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এক্ষেত্রে যোগাযোগ উদ্দেশ্য, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে-

- ✓ 'সাদৃশ্য' এবং 'পরিপূরক' সাধারণত বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।
- ✓ 'সংগতিপূর্ণ' এবং 'পরিপূরক'ও বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।
- ✓ 'সাদৃশ্য' এবং 'সংগতিপূর্ণ' এর মধ্যে কোন আন্তঃসম্পর্ক নেই।

যোগাযোগ নির্ধারণের মানদন্ড সমূহ বিবেচনায় নিয়ে যথার্থভাবে সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরির চেষ্টা করা হয়।

**সারসংক্ষেপ:**

বিপণন যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও প্রসার, মিথস্ক্রিয়া বিপণন, ইভেন্ট ও অভিজ্ঞতা এবং মোবাইল বিপণন। নির্দিষ্ট উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থ প্রদত্ত উপায়ে পন্য, সেবা বা ধারণার নৈর্ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক উপস্থাপনাকে বিজ্ঞাপন বলে। আর বিক্রয় প্রসার হল একটি পণ্য বা সেবার ক্রয় বা বিক্রয়কে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানি প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী প্রণোদনা। মিথস্ক্রিয়া বিপণন হলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অডিও, ভিডিও, তথ্য চিত্র, গেমস, ব্লগিং, ই-মেইল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ড এবং ভোক্তার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার একটি প্রক্রিয়া। বিপণনে ইভেন্ট বলতে মূলত বিশেষ কোন সমাবেশ, ঘটনা, উৎসব বা মেলা ইত্যাদিকে বোঝায় যেখানে কোন ব্র্যান্ডের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার সুযোগ তৈরি হয়। অপরদিকে 'অভিজ্ঞতা' হলো ভোক্তাকে কোন একটা বিশেষ কাজ হাতে কলমে করিয়ে ব্র্যান্ডের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম। এসবের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে ভোক্তাদের হাতে হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে যাওয়ায় এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠায়, মোবাইলে বিজ্ঞাপন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন প্রিন্ট, রেডিও, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মতো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদান করা যায়। কার্যকর বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য পজিশনিং কৌশল ও সৃজনশীল কৌশলের সমন্বয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বিক্রয় প্রসার প্রধানত ভোক্তা বা বাণিজ্যিক বিক্রয় প্রসার হিসেবে চালু করা যেতে পারে। ইভেন্ট স্পন্সরশীপের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণির অভীষ্ট বাজার তৈরি করা যায়, ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা যায়, ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করা যায়, ক্রয় সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা যায়, সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায় এবং তাৎক্ষণিক বিক্রয় সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। ব্র্যান্ড পরিবর্ধক হলো কিছু বিপণন যোগাযোগ উপাদান যা গতানুগতিক প্রসার কার্যক্রম তথা বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদির প্রভাবকে অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করে। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে-জনসংযোগ ও পাবলিসিটি বা প্রচার এবং ওয়ার্ড অব মাউথ বিপণন। জনসংযোগ বলতে বোঝায় অন্যরা কীভাবে একজন ব্যক্তি, ব্র্যান্ড বা কোম্পানিকে দেখে এবং অনুভব করে তারই সফল ব্যবস্থাপনা। আর প্রচার হল সরাসরি সময় এবং স্থানের জন্য অর্থ প্রদান না করে মিডিয়াতে বাণিজ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য সংবাদ স্থাপন করে একটি ব্র্যান্ড, অফার বা ব্যবসা সম্পর্কে যোগাযোগ। অন্যদিকে ভোক্তাদের মুখে মুখে ব্র্যান্ড সম্পর্কে যে মন্তব্য ঘুরে বেড়ায় তাই হচ্ছে ওয়ার্ড অব মাউথ বা মুখের কথায় বিপণন। বিপণন যোগাযোগ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিপণন যোগাযোগের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ, কনটেন্ট, চ্যানেল এবং ফলাফলের কৌশলগত ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ বলে। সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের ছয়টি মানদন্ড রয়েছে যথা- পরিধি, অবদান, সাদৃশ্য, পরিপূরক, সংগতিপূর্ণ, এবং ব্যয়।

## ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ব্র্যান্ড উপাদান কী?
২. ব্র্যান্ড উপাদানের বিভিন্ন প্রকারভেদ/বিকল্প ও কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ব্র্যান্ড উপাদান নির্ধারণ করার নির্ণায়কসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
৪. ব্র্যান্ড উপাদান কেন পছন্দ করতে হয়?
৫. ব্র্যান্ড নাম কী?
৬. ব্র্যান্ড নাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৭. ব্র্যান্ড নামকরণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।
৮. কার্যকর ব্র্যান্ড নামের গুণাবলী বর্ণনা করুন।
৯. ব্র্যান্ড নামের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১০. ইউআরএল কী?
১১. ইউআরএল এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
১২. লোগো এবং প্রতীক বলতে কী বুঝায়?
১৩. লোগো এবং প্রতীকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১৪. ব্র্যান্ড চরিত্র বলতে কী বুঝায়?
১৫. ব্র্যান্ড চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১৬. স্লোগান বলতে কী বুঝায়?
১৭. স্লোগানের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
১৮. ঝংকার বলতে কী বুঝায়?
১৯. ঝংকারের সুফল বর্ণনা করুন।
২০. মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং বলতে কী বুঝায়?
২১. প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২২. প্যাকেজিং এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২৩. প্যাকেজিং পরিবর্তন এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২৪. বিপণনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করুন।
২৫. পণ্য কৌশল বলতে কী বুঝায়?
২৬. বিক্রয়োত্তর ক্রেতা ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।
২৭. মূল্য সম্পর্কে ভোক্তার অভিমত অনুধাবনের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।
২৮. মূল্য সম্পর্কে ভোক্তাদের অভিমতের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
২৯. ভ্যালু নির্ভর মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩০. মূল্য স্থিতিশীলতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৩১. প্রণালী ডিজাইন বলতে কী বুঝায়?
৩২. পরোক্ষ বণ্টন প্রণালী ব্যাখ্যা করুন।
৩৩. প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রণালী ব্যাখ্যা করুন।
৩৪. অনলাইন কৌশল বলতে কী বুঝায়?
৩৫. বিপণন যোগাযোগের উপায় সমূহ বর্ণনা করুন।
৩৬. যোগাযোগের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল আলোচনা করুন।
৩৭. একটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের সম্ভাব্য ভুলসমূহ আলোচনা করুন।
৩৮. একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানের ফলে কী অর্জিত হয়?

৩৯. একাধিক প্রসার উপাদানের যুগপৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করুন।
৪০. প্রধান বিপণন যোগাযোগ উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।
৪১. কার্যকর বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন ডিজাইনের উপাদান সমূহ বর্ণনা করুন।
৪২. বিক্রয় প্রসার বলতে কী বুঝায়?
৪৩. ইভেন্ট স্পন্সরশীপের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।
৪৪. ব্র্যান্ড পরিবর্ধক কাকে বলে?
৪৫. সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ প্রোগ্রামের মানদন্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।
৪৬. সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ নির্ধারণের মানদন্ড ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন।

**তথ্যসূত্রঃ**

১. Keller, K. L. (2003). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity* (4th Edition), Pearson Education Limited, England.

২. Bovee, C. L., Houston, M. J., & Thill, J. V. (1995). *Marketing* (2nd Edition), London, McGraw-Hill.

৩. Dirksen, C. J., & Kroeger, A. (1973). *Advertising Principles and Problems*, R.D. Irwin. Inc., Homewood, Illinois.

৪. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V. (1999). *Principles of Marketing* (Second European Edition), Prentice Hall Europe.

৫. Mills, P. (2024). *What is a Jingle?* Retrieved from: https://www.vcmo.uk/resources/glossary/what-is-a-jingle-in-marketing (Accessed: 11th July, 2024).

৬. Kotler, P., & Armstrong, G. M. (2010). *Principles of Marketing*, Pearson Education, India.

৭. Rossiter, J. R., & Percy, L. (1997). *Advertising and Promotion Management* (2nd Edition), McGraw-Hill, New York.

৮. Belch, G. E., & Belch, M. A. (2004). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective* (6th Edition), McGraw-Hill, New York.

৯. মোহাম্মদ আবদুল হাই (২০১৭), ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, বিশাল বুকস্ কমপ্লেকস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১০. মুহাম্মদ সৈয়দুজ্জামান, মোঃ মনোয়ারুল কবির, রোখসানা বিনতে কাশেম, মোঃ আবু সুফিয়ান মজুমদার, মোঃ আল আমিন এবং মোঃ কামরুজ্জামান (২০১৯), ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা, গ্রন্থ কুটির, ২৬ বাংলাবাজার, আলীরেজা মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০।